অপেক্ষাগৃহ

প্রতিভা বসু

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
হীরক রায়
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট, (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ;
নভেম্বর ; ১৯৬১

মুদ্রক :
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র নাথ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার অন্যান্য বই :—

ঈশ্বরের প্রবেশ
সোনালী বিকেল
সমুদ্র হৃদয়
সকালের সুর সায়াহ্নে
পদ্মাসনা ভারতী
সমুদ্র পেরিয়ে

অপেক্ষাগৃহ

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, দেবযানী পাশ ফিরলেন। মাথার কাছে টেবিলে জলের গ্লাস ঢাকা আছে, মশারীর ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা এনে জল খেলেন, তারপর আবার রেখে দিলেন। একটা মশা ঢুকেছে, গুনগুন করছে কানের কাছে, কপালে এসে বসছে, চাপড় মারলেন, মারতে পারলেন না, উড়ে গেল।

রাত এখন গভীর। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার, নিমগাছটা পাহাড়ের মতো বড়ো হ'য়ে উঠেছে সেই অন্ধকারে, পাখিরা ডানা ঝাপটালো, পাশের আমগাছ থেকে প্যাঁচা ডেকে উঠলো, একটু দূরে খালের ওপার থেকে একপাল শেয়ালের ডাক শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুরগুলোও গলা মিলিয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো। এর মধ্যে গোটা পাঁচেক দেবযানীরই আশ্রিত, তাঁর দাওয়ায় পড়ে থাকে, দু'মুঠো খায় আর রাত্তিরে, কারণে অকারণে ডেকে উঠে বাড়ি পাহারা দেয়। তাতে চোরও যেমন বিরক্ত হয়, গৃহস্থরাও তেমনি বিরক্ত হয়। দেবযানি তো বটেই। তাঁর কানের কাছেই তো এই চিৎকার। অনেক সময় উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বকেন, থামতে বলেন, তারা অসময়ে দেবযানীর গলা শুনে খুশিতে অস্থির হয়, ল্যাজ নাড়ে, মুখ দিয়ে অনেক আকুতির শব্দ বার করে। দেবযানী জানালা দিয়েই আদর করেন, বলেন, একটু কি ঘুমুতে দিবিনা? শেষে কি মার খেয়ে মরবি? পাড়ার সকলে খুব রেগে যায় কিন্তু, এক্ষুণি লাঠি নিয়ে আসবে।

জল খেয়ে আবার বালিশে মাথা দিয়ে টের পেলেন তাঁর বালিশটা ভেজা, দুই চোখে জলের সমুদ্র। কী হলো? স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? মন যেন প্রবোধ মানছে না। মনও না, চোখের জলও না। বালিশের তলা

থেকে রুমাল বার করে মুছলেন। আর তক্ষুনি নেটের মশারীর চালের উপর দিয়ে সিলিংয়ে পাখা ঝোলাবার আংটাটা চোখে পড়লো। এটা কেন ঝুলিয়েছিলো কে জানে, এটা বাড়তি, এটার কোন প্রয়োজন নেই। পাখা ঘুরছে ঘরের মাঝখানে সিলিংয়ে। অবশ্য এখন ঘুরছে না। এখন লোডসেডিং। শোবার সময়ই অন্ধকার ছিলো, লণ্ঠন কমানো আছে পায়ের তলায়, সারা ঘরটায় ভুতুড়ে ছায়া। আব সেই ছায়া আলোতেই চকচক্‌ করছে লোহার গোল আংটাটা। চোখটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনিমার স্বামীকে মনে পড়ে গেল। অনিমা তাঁর অল্প বয়সের বন্ধু। তার স্বামী রজত এই রকমই একটা আংটার সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁসি গিয়েছিলো। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কতো সহজেই প্রাণ ত্যাগ করে ফেললো ভদ্রলোক। নিজের স্বামীকেও মনে পড়লো। সে কিন্তু যেতে চায়নি। জীবনের প্রতি বড়ো মমতা ছিলো তার। জীবনের প্রতিও স্ত্রীর প্রতিও। তবু তাকে যেতে হলো। একান্ত অসময়ে। একান্ত অনিচ্ছায়। দেবযানী লো প্রেশারে ভুগছিলেন তখন, রোজ গ্লুকোজ ইনজেকসন দিতে হচ্ছিলো। শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই শয্যায় শুয়েই সন্দীপনের শেষ শয্যা দেখতে হলো। তিনি শয্যাত্যাগ কবলেন।

এই লো প্রেশারে আরো একবার খুব ভুগেছিলেন, সেই সময়ে অভ্যন্তরে একটি শিশু ছিলো। প্রথমে বুঝতে পারেননি, যখন পারলেন বালিশে মুখ ঢেকে কেঁদেছিলেন। সন্দীপন বললো, 'কী বোকা। কাঁদছো কেন?'

কেন কাঁদছেন তা সন্দীপন জানতো। একটা ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁর অনেক ধার হয়েছিলো। ব্যবসা উঠে গেল ধারটা রইলো। আর তার সঙ্গে জুটলো স্ত্রীর এই নিম্ন রক্তচাপের অসুখ। চিকিৎসার খরচ জোগাতে বেচারা প্রাণান্ত। ধারের টাকা কোথা থেকে দেবে তার তো কোনো ঠিকই নেই। কী নিদারুণ অনটনের মধ্যে যে সময় চলছিলো বলা যায় না। সেই সময়ে এই শিশু কেন এলো?

দেবযানীর বদান্যতায় বাড়ি তাঁর সব সময়েই অতিথিবহুল। দেওর ভাসুর শ্বশুর ননদ খুড়ো জ্যাঠা যার যখন প্রয়োজন সবাই এসে উঠেছে তাঁর কাছে। ইচ্ছেসুখ থেকেছে খেয়েছে, কোন বিনিময়ের ধাব না ধেরেই চলে গেছে অভদ্রের মতো। সন্দীপন পছন্দ কবেনি। এ নিয়ে তর্ক করেছে স্ত্রীর সঙ্গে, বলেছে, 'এরা তোমারই বা কে, আমারই বা কে? কেন এসে ওঠে যখন তখন? এইটুকু একটা বাড়ি, কতো সময় কাজের লোক থাকে না, তোমার তো দেখি নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয় না। এদের সেবা করে কী মোক্ষলাভ হচ্ছে শুনি? আমি যখন আমার বিধবা মাকে নিয়ে ষোলো বছর বয়সেই অকূলে ভাসলাম এরা কি এসে আমাকে দেখেছিল? না, এইসব লোককে আর আমি প্রশ্রয় দেবো না। তোমার এইসব ভালোমানুষি আমার অসহ্য লাগে। রমেশ মিত্রকে দেখছো না, কেমন টুরে এসে এখানে উঠে এখানে খেয়ে লম্বা লম্বা টি এ বিল করছে। একটাই মাত্র শোবার ঘর, তুমি ঘুর ঘুর করছো এদিকে ওদিকে, তিনি দিব্যি তোমার বালিশে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। কী সুবাদে? না, তিনি আমার পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা। তাঁর মৃত্যুর সময় কোথায় ছিলো এইসব ভ্রাতারা?'

দেবযানী স্বামীর মুখ চেপে ধরেছেন, 'চুপ চুপ, শুনবে শুনবে। কী আছে দু'দিন চারদিন এসে থাকলে?'

কিন্তু সত্যিই কি কিছু হয়নি? হয়েছে। অভাব আর ঘোচেনি। একটি একটি করে পিতৃদত্ত সব গহনাই কোথায় তলিয়ে গেছে একদিন। তারপর কখন যেন রোদ উঠেছিলো একটু, দিনগুলোকে যেন মুঠোয় এনে ফেলতে পেরেছিলেন, সহসা কী দুর্মতি হলো সন্দীপনের, প্রকাশক হতে চেয়ে আবার সমূলে ডুবলো। সেই ডুবন্ত তরীতে নিজেরাই হাবুডুবু খাচ্ছেন, তার উপর বড়লোকি অসুখ, তার উপর অভ্যন্তরস্থ প্রাণের উদগম। না কেঁদে করবেন কী?

দুই

যারা আসে যায় থাকে খায়, যাদের অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল, এমন অনেকের কাছে কিছু ধার চেয়ে চিঠি লিখেছিলো সন্দীপন। জবাব পায়নি। তবে মন্দের ভালো এইটুকু হয়েছে, আর তারা উঠছে না এসে। কিন্তু একের ঋণ অপরে শোধ করে। এই ব্যবস্থা সূত্রেই আলাপ হয়েছিলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। অল্পসময়ের মধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, নিরুপায় হয়ে লজ্জা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তাঁকেই শেষে সন্দীপন নিজের এই বিপদের বার্তা জ্ঞাপন করলো। তিনি চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার জীবনেও আমি এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এর কষ্ট হাড়ে হাড়ে জানি। এখন এই মুহূর্তে অন্তত আর্থিক সংগ্রামকে সর্বতোভাবে পরাস্ত করেছি। আপনি ভাববেন না। আমি আছি।'

তিনি সত্যিই থাকলেন। একদিন দুদিন নয়, আজীবন। অভ্যন্তরস্থ যে প্রাণকে ডাক্তার তাঁর ভাষায় 'ইমিডিয়েটলি রিমুভ' করে দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন 'নইলে আপনার স্ত্রীর প্রাণসংশয় অবধারিত' সেই শিশু বলা যায় এঁর দয়াতে—না দয়াতে নয়, চেষ্টায় ভালোবাসায়, পরার্থপরতায়, নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলো। দেবযানীকেও যেমন শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করেছেন, শিশুকেও তেমনি শহরের সেরা ডাক্তারই প্রসব করালেন। বাচ্চা হবার পরেও নার্স এলো, আয়া এলো, ত্রুটি কোথাও নেই। সন্দীপন খুব খুশী। তার মতো নির্ভরশীল চরিত্রের পক্ষে এরকম একজন বন্ধু পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। এখন তাকে কিছু বললেই সে বাতাসে হাত নাড়ে, 'আমার কাছে প্যান প্যান কোরো না, বিমলেন্দুকে বলো।'

দেবযানী বলেন, 'সবই কি ওঁকে বলা যায় নাকি?'

'কেন যাবে না, উনি কি আমাদের পর? বুঝলে মণি, তুমি এতোকাল ধরে যতোগুলো মানুষকে যা করেছো, এই বন্ধুতা তারই বিনিময়।'

দেবযানী বিরক্ত হয়েছেন, এটা তার ঠিক মনে হয়নি। বলেছেন, 'তা হলেই কি একজন তৃতীয় ব্যক্তির মাথায় নিজের সংসারের সকল দায়িত্ব তুমি চাপিয়ে রাখবে ?'

'উনি ওসব ভালোবাসেন।'

'বাসুন বা না বাসুন, তোমার কর্তব্য তোমারই পালন করা উচিত। বিয়ে করেছিলে কেন বল তো ?'

'কী আশ্চর্য। বিয়ের সঙ্গে ও সবের কী সংশ্রব ? বিয়ের যেটা মোক্ষম সর্ত স্ত্রীকে ভালোবাসা তাতে আমি নিশ্চয়ই পয়লা নম্বরেরও উপরে।'

'ভালোবাসলে তার জন্য অনেক ত্যাগও করতে হয়।'

'করিনি ? বল কী ? আমার সমস্ত সত্তাই তো আমি তোমাকে সমর্পণ করেছি।' বলতে বলতে সারামুখে হেসে কাছে টেনে নেয়।

সন্দীপনের ভালোবাসা সত্যিই নিখাদ। অনেকটা শিশুর সমর্পণের মতো। এর মূল্য সাংঘাতিক।

দেবযানী তাঁর কুড়ি বছর বয়সে সন্দীপনের ঘরনী হয়ে এসেছিলেন। স্বামীর এই অম্লান, অশেষ নির্ভরশীল ভালোবাসায় অবগাহন করে সত্যি সুখের তার সীমা ছিলো না।

সন্দীপন তার মায়ের একমাত্র সন্তান। শুধু তাই নয়, অনেক তাবিজ কবজ সাধু সন্ন্যাসী ডাক্তার ওষুধের সমারোহে অধিক বয়সে এই সন্তানের জন্ম। ছেলে তাঁর প্রাণ। ছেলেকে তিনি চোখে হারান। ছেলেও মা ছাড়া জানেনা। মায়ের কথা তার বেদবাক্য, মায়ের ইচ্ছেই ইচ্ছে। অল্প বয়সেই পিতাকে হারিয়ে মা আর ছেলে আরো নিকট হয়ে গিয়েছিলো। মাকে সর্ব রকমে খুশী করার আদর্শ নিয়েই সে বড়ো হয়ে উঠেছিলো। ছবি আঁকায় প্রতিভা ছিলো কিন্তু সে লাইনে না গিয়ে বি এ পাশ করেই ঢুকে পড়েছিলো চাকরিতে। বাবার সামান্য লাইফ

ইনসিওরেন্সের টাকায় কোনো রকমে কাটাতে পেরেছিলো বি এ পর্যন্ত, তারপরে রিক্ত হস্ত মায়ের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো বড়ো উদ্দেশ্যের দিকেই ধাবিত হয়নি।

কিন্তু তবু এই ছবি আঁকার টিউশনি করতে গিয়েই দেবযানীর সঙ্গে দেখা। দেবযানীর বাবা দিল্লীনিবাসী। দেবযানী সেখান থেকেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে কলকাতায় কাকার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। আসলে বেড়াতে নয়, তাঁর মা তাকে বিয়ে দিতে নিয়ে এসোছিলেন কলকাতা, অর্থাৎ বঙ্গদেশে। কাকার মেয়ে অরুণাকে আঁকা শেখাতো সন্দীপন।

ছবি আঁকায় সন্দীপনের ছোটোছোটো মহলে বেশ নাম ছিলো। চাকরির বাইরে এই বিদ্যা তাকে বাড়তি উপার্জনে সমৃদ্ধ করতো। পুস্তক প্রকাশনার উৎসাহ তার পুস্তকের মলাট এঁকে এঁকেই।

কাকা একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের আপিসে বড়ো কাজ করেন। এই বিজ্ঞাপনের আপিসেই 'ফ্যামিলি' নামের একটি বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে সন্দীপন কাকার চোখে পড়ে যায়। আরো কাজ তো তিনি তাকে দিলেনই উপরন্তু মেয়ের জন্য ভালো মাইনে দিয়ে মাষ্টার হিসেবেও রাখলেন। তাঁদের পরিবারেও একটা ছবি আঁকার ঐতিহ্য আছে। দেবযানীর পিতামহ সিদ্ধেশ্বর তালুকদার দিল্লীর বিখ্যাত শিল্পী। বাবা কাকা অবশ্য সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেননি কিন্তু প্রতিভা তৃতীয় পুরুষে বর্তালো। দুই ভাইয়ের দুই মেয়েই রং তুলি নিয়ে খেলা করে বাচ্চা বয়েস থেকে।

প্রেমটা অরুণার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিলো। দেবযানী সুন্দর নন, অরুণা সুন্দরী। তার চেয়ে দু'বছরের ছোটো, বি এ পড়ে।

যা উচিত তাতো কোনো সময়েই হয়নি। তাই পঁচিশ বছরের সন্দীপন সতেরো বছরের সুন্দরী অরুণার প্রেমে না পড়ে প্রায় কুড়ি বছরের রোগা শ্যামলা মেয়ে দেবযানীর প্রেমে পড়লো। দেবযানীও

সন্দীপনের স শুনলেই মূর্ছা যেতে লাগলেন। কাকা কাকীমা মা অরুণা, সবাই টের পেলো। কিন্তু সবাই চুপ। যেন কিছু বোঝে না। সন্দীপনই একদিন বীর যুবকের মতো ঘোষণা করলো, 'আমি দেবযানীকে বিয়ে করতে চাই। আপনারা অনুমতি করুন।'

কাকার এলগিন রোডের বাড়িতে ঢাকা গোল বারান্দায় চায়ের আসর বসেছে, কাকিমা চা ঢেলে দিচ্ছেন, মা খাবার সাজাচ্ছেন, দেবযানী আর অরুণা এগিয়ে দিচ্ছে, এই সময়ে এই প্রস্তাব। সবাই হকচকিয়ে হতবাক। কাকা তো তো করলেন, মা কী আনবার অছিলায় রান্নাঘরে পালালেন। অরুণা তাকে চিমটি কাটলো, কাকিমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমরা অনুমতি করলেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'দেবযানীর মত জেনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মায়ের মত জেনেছ?'

'মায়ের মত নেই।'

'তবে কী করে হবে?'

'বিয়ে তো করবো আমি।'

'বিয়ে করে নিশ্চয়ই মাকে তাড়িয়ে দেবে না।'

'না না সে কী—'

'বৌ নিয়ে তাহলে নিশ্চয়ই মার কাছেই উঠবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'মা যদি মেনে নিতে না পারেন?'

'কেন পারবেন না? আমাকে যিনি এতো ভালোবাসেন আমার ভালোবাসার জনকেও তিনি ভালোবাসবেন।'

এতোক্ষণে কাকার কথা ফুটলো, 'যা মাইনে পাও তাতে কী করে চলবে তোমার?'

'বিয়ের কথা ভেবে এর মধ্যেই আমি দুটো টিউশনি যোগাড় করে

ফেলেছি। ভালো মাইনে। তাছাড়া ব্যবসায়িক ছবি আঁকা তো আছেই। আপনার কাছেই তো কতো কাজ পেয়েছি।'

চুপ করে থেকে কাকা বললেন, 'ঠিক আছে, ভেবে দেখি। দাদাকেও তো জানাতে হবে।'

সন্দীপন দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্য ভালো, সোজাসুজি মানুষ। তার উপর সংসার নিতান্তই ছোটো। মাত্রই মা আর ছেলে। পরামর্শ সভা বসলো। সেখানে গুণের তালিকায় এসব যোগ হলো। আরো যোগ হলো, সে বুদ্ধিমান, ট্যালেনটেড, সৎ সাহসের অধিকারী। এইসব ভূষণের কম মূল্য নেই। তবে দেবযানীর বাবা মেয়ের জন্য যথেষ্ট টাকা ঢালবার ক্ষমতা রাখেন। অবশ্যই এর চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য পাত্র পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর কন্যাই তো বৈরী। দেবযানী অরুণার মারফৎ জানালো, সম্বন্ধ করে সে বিয়ে করবে না। এই হলো এক নম্বর। সেজেগুজে পাত্রপক্ষের কাছে সে কখনোই নিজেকে মনোনীত করার জন্য ভিক্ষুকের মতো বসতে পারবে না। এই হলো দুই নম্বর। যে পাত্র টাকা নিয়ে বিয়ে করতে আসবে তাকে সে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। এই হলো তিন নম্বর। আর সব শেষে জানালো এই মুহূর্তে বিয়ে করবার বাসনা তার আদৌ নেই। যদি করে তবে এই সন্দীপনকে ছাড়া আর কারোকে নয়।

অনেক বাদানুবাদ। অনেক ভাবনা-চিন্তা। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল সব। দেবযানীর বাবা ছুটি নিয়ে এলেন মেয়ের বিয়ে দিতে। সন্দীপনের মা এসে পাকা দেখা দেখে গেলেন গিনি দিয়ে। মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয়া হলো, জ্ঞাতিগুষ্ঠি কুটম্বেরা ভিড় করলো তিন দিন ধরে, নহবৎ বসলো সদর দরজায়, অনেক ধূমধাম করে হয়ে গেল বিয়ে। দেবযানী সন্দীপনের কাপড়ের খুঁটে গিঁট বেঁধে পরের ঘরে চলে এলেন।

তিন

এক ঘর ছেড়ে আর এক ঘরে ঢুকবার মুখে কান্নাকাটি অনেক হয়েছিলো। মেয়েদের এই কষ্টের তুলনা আজো খুঁজে পান না দেবযানী। আবার যাকে অবলম্বন করে এই বিচ্ছেদ তার সান্নিধ্যসুখের তুলনা মেলাও ভার। সন্দীপন তাঁর সব অভাব পূরণ করে দিয়েছিলো। দেবযানী তার পলকে প্রলয়। বউ বিহনে সে একদণ্ড থাকতে নারাজ। সন্দীপনের ভালোবাসার এটাই ধরন। নিজের মাকেও সে এই রকম অন্ধভাবে ভালোবেসেছে। মাকেও সে একদিনের জন্য ছেড়ে থাকতে পারেনি। মা তার সব করে দেবে। মা রান্না না করলে খাওয়া হয় না, মা টেবিল গুছিয়ে না দিলে বসা হয় না, মা রং তুলি হাতের সামনে না এনে দিলে ছবি আঁকা হয় না, মা ডেকে না দিলে ঘুম ভাঙে না, মা তাগাদা না দিলে স্নানে যায় না—সব মা। মা আর মা। মায়েরও ছেলের প্রতি সব সেবাই অবিচলিত। যদিও সারাক্ষণই চ্যাঁচামেচি করছেন, 'আর পারি না বাপু। ঘরে বউ এনে নাও সে সহ্য করুক তোমার অত্যাচার। আমার সয় না। দিন নেই রাত নেই কেবল ফরমাস। কেন, রমেশের মা আছে কী করতে? খাওয়া পরা মাইনে দিয়ে তাকে পোষা হচ্ছে কী জন্য? সবই যদি মা করবে? আমি জল না দিলেই গ্লাসে গন্ধ, আমি চা না দিলেই হয় তেতো নয় জল, আমি এক-পা বেরুলেই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র। কেন?'

যতোই চ্যাঁচান তাতে তাঁর সুখ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো। ছেলে যে এতো বড়ো হয়ে গিয়েও মা মা রব ছাড়তে পারছে না তাতে তাঁর গৌরব ছিলো। মায়েরা সন্তানদের চিরশিশুরূপে দেখতেই ভালোবাসেন। তিনিও বাসতেন। লোকের কাছে ছেলের নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করতে করতে মুখমণ্ডল তাঁর তৈলাক্ত মসৃণ দেখাতো। চোখের কোলে সুখের হাসি বর্ষাকালের খাল বিলের মতো ছলছল করতো। সেই ছেলে একদিন-যখন বললো যে, 'মা, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।'

শুনে মা এমনি চমকে উঠেছিলেন যে হাত থেকে একটা কাঁচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল।

মাকে ছাড়া, মায়ের অনুমোদন ছাড়া তাঁর ছেলে তাঁর অগোচরে আর একজন মেয়েকে ভালোবেসেছে এই খবর তাঁকে প্রায় বজ্রাহত করলো। হঠাৎ গর্জে উঠে বললেন, 'এতো স্বাধীন তুমি কবে থেকে হলে ?'

সন্দীপন অবাক হয়ে বললো, 'স্বাধীন ! স্বাধীন মানে ?'

'এমনিতে তো দেখি মা ছাড়া কিছু জানো না, বিয়ে করবার বেলায় আর মায়ের কোনো প্রয়োজন নেই, না ?'

'এর মধ্যে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা উঠছে কিসে ?'

'আমার অনুমতি নিয়েছিলে ?'

'তাই জন্যই তো বলছি। তোমাকে না বলেই আমি বিয়ে করবো নাকি ?'

'না বলে যদি ডুবে ডুবে জল খেতে পারো, বিয়ে করতেই বা বাধাটা ছিলো কোথায় ?'

'কী সব বলছো তুমি ? আমি তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ডুবে ডুবে জল খাবো কেন ? মিথ্যে কথা বলেছি নাকি ? চুরি করেছি নাকি ?'

'হ্যাঁ চুরিই করেছ। প্রিয়নাথ তালুকদার মেয়েকে ছবি আঁকা শেখানোর জন্যই তোমাকে রেখেছিলেন, এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য নয়। মনে রেখো, তুমি তার গুরু, মাষ্টার, গুরু পিতৃতুল্য, তার বাবা মা—'

এইখানে সন্দীপন অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো। হাসি আর তার থামে না—'

'হাসছো যে ?' মার চোখে রাগের আগুন গাঢ় হলো।

সন্দীপন হাসতে হাসতেই বললো, 'হাসবো না ? হাসির কথা শুনলে হাসতেই হয়। আজ তোমার হয়েছে কি বলো তো ? আমি

বিয়ে করলে তো তোমার খুশি হওয়াই উচিত। তুমি তো কতোদিন বলেছ, এবার বিয়ে করে নে, ঘরে বউ এনে নে? আর বিয়ের কথা বলা মাত্রই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে। কী? হয়েছে কী তোমার।' মায়ের কাঁধে হাত রাখলো, 'তুমি খুশি হবে না আমি বিয়ে করলে?'

মা গম্ভীরভাবে বললেন, 'খুশি অখুশির কথা নয়, আমার মতে এখনো তুমি বিয়ের উপযুক্ত হওনি। তা ছাড়া প্রিয়নাথ তালুকদারের মেয়েকে বিয়ে করো সেটাতেও আমার মত নেই।'

'কী আশ্চর্য! প্রিয়নাথ তালুকদারের মেয়েকে আমি বিয়ে করছি এই খববটা তোমাকে কে দিল?'

'তা হলে কাকে?' মা অবাক। 'আবার কোন মেয়েকে তুই চিনিস? কই, আমাকে তো কিছু বলিসনি। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে আজকাল কার কাব সঙ্গে মিশিস বল তো?'

'লুকিয়ে মিশবো কেন?' এতোক্ষণে বিরক্ত হলো সন্দীপন।

'আর প্রিয়নাথ তালুকদারের মেয়েকে বিয়ে করলেই বা তোমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে তা তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'অত বড়োলোকের মেয়ে তোর সঙ্গে বিয়ে দেবেই বা কেন?'

'যদি দেয় তাতে তোমার বলবার কিছু নেই।'

'দিলে বুঝতে হবে না দিয়ে উপায় ছিলো না তাই।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জানো না কী বলতে তুমি কী বলছো। যাকগে আমার যা জানাবার জানালাম।'

এরপর দেয়ালে লটকানো পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সন্দীপন। মা তার পিঠের উপর এই কথা কটা ছুড়ে দিলেন, 'বেইমান। দুধকলা দিয়ে তোকে আমি কাল সাপ পুষেছি। গুষ্টির কুষ্টি। দিনে রাত্রে আমি খেটে মরবো আর তুমি ভালোবাসাবাসি করে বিয়ে করবে। কেন? আমি কি তোর কেনা দাসী? ঝি? যতোদিন পাখা গজায়নি ততোদিন মা। এখন আর মাকে দিয়ে কী দরকার?

স্বার্থপর ! আত্মসারা,—একা ঘরে সমানে চেঁচাতে থাকেন।

নিশ্চয়ই মা ছেলের এই ঝগড়া স্থায়ী হয়নি। তা হলে আর গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করতে আসবেন কেন ? তবে তিনি যে এই ব্যাপারে একেবারেই তুষ্ট নন সেটা দেবযানী গোড়া থেকেই টের পেয়েছেন। তুষ্ট না হবার কারণটাও তাকে খুব বেশী হাতড়াতে হয়নি। পুত্রেব উপব অপ্রতিহত অধিকারে অন্য কোনো মেয়ের এই হস্তক্ষেপ তিনি একবিন্দু বরদাস্ত করতে পারছেন না। তাঁকে ব্যতীত সন্দীপনের অন্য কোনো মেয়ের প্রতি এই ভালোবাসাও তাঁকে কম উত্তেজিত করেনি।

বুঝতে পারছিলেন হেমলতার দুটো প্রবৃত্তি বড়ো প্রবল। তিনি ক্রোধ এবং অসূয়া দুইয়ের দ্বারাই অতিমাত্রায় আক্রান্ত।

চার

দেবযানী তালুকদারদের বাড়ির বড়ো মেয়ে, প্রথম শিশু। তখন ঠাকুমা দাদুও জীবিত ছিলেন। নিঃসন্তান পিসি, বিধবা জ্যাঠাইমা, মা বাবা দাদু ঠাকুমা কাকা কাকীমা সবাই মিলে তাদের সকল যত্ন ভালোবাসা মনোযোগ দিয়ে ভরে রেখেছেন। তাঁদের পরিবারে সকলের স্বভাবই বড়ো শান্ত। বাবা কাকা পিশি সকলেই মিষ্টভাষী এবং সংযত। সকলের সঙ্গে সকলের মিলও যথেষ্ট। মা কাকীমা পিসি গলায় গলায়, বাবা কাকা গলায় গলায়, তাঁরা ভাইবোনেরাও সবাই গলায় গলায়। অরুণার পরেও তাঁর কাকার আরো একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে আছে। তাঁর নিজেরও দুটি ভাই আছে। দিদি তিনি একলা।

এইরকম একটা পরিবারের মধ্যে বড়ো হয়ে ঝগড়াঝাটি বিরোধিতা ভালোবাসার অভাব—এসবের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিলো না। সন্দীপনের মাকে তিনি মা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ধাক্কা খেয়েছেন প্রচুর। ধাক্কা সন্দীপনও খেয়েছে। সে কল্পনাও করেনি তার মা তার বৌকে এমন বিদ্বেষের চোখে দেখবেন। আগে সন্দীপন আর তার মা

এক ঘরেই শুতেন। বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা ঘরে শুতে গেলেই তাঁর চোখ বাঘের মতো জ্বলে ওঠে। আর দরজা বন্ধ করলে তো কথাই নেই। সেটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। সন্দীপন বলে, 'যাক গে, মা যখন চাননা খোলাই থাক দরজা।' দেবযানীর লজ্জা করে। এক দরজার ব্যবধানে পাশাপাশি দুটি ঘরের একটিতে এমন আব্রুহীন ভাবে নববিবাহিত জীবনযাপন করতে তাঁর কুণ্ঠার অন্ত থাকে না। তাব উপর ভোর না হতে শাশুড়ি যখন এক কাপ চা নিয়ে এসে ছেলের ঘুম ভাঙান তখন দেবযানীব মনে হয় ধরণী দ্বিধা হও। শাড়ি টারি ঠিক থাকে না, চোখে ঘুম জড়িয়ে থাকে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়তে ছাড়তেই শাশুড়ির প্রখর দৃষ্টি বিদ্ধ করে তাঁকে। তাঁর ভয় করে।

সন্দীপন নির্বিকার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শিথিল হাতে পাশ ফিরে চুমুক দেয় চায়ে তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমুবেই তো। রাত দশটায় শুয়ে রাত যে কী ভাবে গড়িয়ে রাত দুটোয় পৌঁছে যায় সে কথা আজ আর দেবযানী মনে করতে পারেন না। কথা কথা কথা। সুখ সুখ সুখ। দেহের সুখ, মনের সুখ, সুখের স্রোত বয়ে যায় দুজন মানুষের যুগল শয্যার উপর দিয়ে। সময়ের জ্ঞান থাকে না। একসময় সন্দীপন বলে 'এই, কাক ডাকছে, ভোর হলো নাকি? ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমিয়ে পড়ো।'

•

যারা ভোররাতে ঘুমোয় তারা ভোর পাঁচটায় উঠতে পারে? অথচ শাশুড়ি আসবেনই ঐ সময়ে। বলেন, 'বিয়ে করেছে বলে কি অভ্যাস বদলাতে হবে নাকি?'

সন্দীপন দেবযানীকে বলে, 'মা ঠিক কথা বলছেন না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক কাপ চা খেতে আমি ভালোবাসি বটে সেটা পাঁচটাতে নয়, ছ'টাতে। ঐ কাপটা বলা যায় অস্পৃশ্যই পড়ে থাকে এবং দিয়ে যায় রমেশের মা। ঘুম চোখেই মায়ের খিচ খিচ শুনি, ঘুম চোখেই টের পাই রমেশের মা এসে কাপটা রেখে গেল। সাতটা বাজলে আর এক কাপ আসে।

আসলে সেটাই আমি খাই। গড়িমসি করে উঠি সাড়ে সাতটা পৌনে আটটায়, তক্ষুনি লেগে যায় আপিসের তাড়া। আর ইদানীং তো মা আমাকে নষ্ট হয় বলে ছ'টার চা দিতেনই না।'

দেবযানী জানালা দিয়ে বাইরে দূরে তাকিয়ে থাকেন। দিল্লীতে, নিজেদের বাড়ির জন্য মন কেমন করে।

সন্দীপন সহজ স্বরে, বলে 'তা বলে তুমি উঠে পড়ো কেন? তুমি তো আর চা খাও না, তুমি ঘুমিয়ে থাকবে।'

দেবযানী বলে, 'বা রে, মা আসেন না ঘরে?'

'এলেই বা।'

'মার সামনে আমি তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকবো?'

'কী হয়েছে?'

সন্দীপন ঐ রকমই। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা যে একান্তই তাদের নিজেদের এ কথাটা মাথাতেই ঢোকে না।

দেবযানী এখনো ভাবেন ঐ গোপনতাটাই ঐ সম্পর্কের মাধুর্য। চোখে চোখে তাকালেই যে ভিতরে ঝড় ওঠে তা ঐ গোপনতাটুকুর জন্যই। সব কিছুর শেষে সব কাজের পরে, আর পাঁচজনের সঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে একলা হলেই যে দুজন মানুষ প্রতিদিন শিহরিত হয়েছেন তার কারণ আর কিছু না, একটা অপেক্ষার প্রাপ্তি।

সন্দীপন বলতো 'তোমার আবার বড়ো বেশী লজ্জা। ঠিক আছে আমি মাকে বলে দেব কাল থেকে যেন অত ভোরে চা নিয়ে না আসেন।'

দেবযানী ত্রাসিত হয়ে বলেন, 'এই, না না, তুমি বলো না।'

'কেন?'

'মা রাগ করবেন।'

'মা রাগ করবেন? মোটেও না। বেঁচে যাবেন। জানোনা তো আমাকে নিয়ে মা কতো বিব্রত। আমার আবদার পালন করতে করতেই ভদ্রমহিলা জেরবার।'

কথাটা মিথ্যে নয়। দেবযানী এ গৃহে এসে থেকেই দেখছেন,

সন্দীপন সংসারের কিছুর মধ্যেই নেই। উপার্জন করে মায়ের হাতে তুলে দিয়েই খালাস। তারপর মা যা দিয়ে যা করেন। তা বলে খাওয়া পরা বিষয়ে সে যে উদাসীন তা নয়। যা খুশি তা পাতের কাছে দিলেই হলো না, যেমন তেমন পোষাকপরিচ্ছদেও তার চলে না। আপিসে যাবার সময় প্রতিদিন পাট করা ধুতি পাঞ্জাবী না হলে চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বাড়ি উথাল পাতাল। মা-ও সমানে চ্যাঁচান, 'কতো টাকা এনে দিস যে এতো ফুটুনি। কটা চাকর দাসী রেখেছিস যে এতো বায়না?'

সে-ও চ্যাঁচায়, 'রমেশের মাকে দাওনা তাড়াতাড়ি ইস্তিরিটা চালিয়ে দিক। আমার সময় নেই।'

'সময় কেবল তোমারি নেই। আর আমরা তো সব পায়ের উপর পা দিয়ে বসে নবাবী করছি কি-না? গরীবের এতো ঘোড়া রোগ কেন শুনি? রমেশের মা বসে ইস্তিরি চালালে বাজারটা করবে কে? রান্নাটা করবে কে? আপনি তো কুটোটি নাড়বেন না। মা তো কেনা দাসী কি-না। সব যোগানই তাকে দিতে হবে।'

হন্তদন্ত হয়ে ভেজা মাথায় চিরুণী চালায় সন্দীপন। সত্যি তার সময় নেই।

'দাও দাও, শীগ্‌গির ভাত দাও। উঃ সামান্য সামান্য কাজ নিয়ে যা চিৎকার করোনা তুমি—এই মনি—' দেবযানীর পিত্রালয়ের ডাক নাম মনি 'কাল থেকে আমার পাঞ্জাবীটা তুমি ইস্তিরি করে রেখো তো।'

দেবযানী সচকিত হয়ে শাশুড়ির দিকে তাকান। শাশুড়ি বলে ওঠেন 'তা তো বটেই, এখন তো বলবিই যে সবই তোর বউ করে দেয়। পঁচিশটা বছর এই মনি তোমার কোথায় ছিলো?'

'কী মুস্কিল। মনি কিছু করলে তো তোমারই সুবিধে।' ধা ধা করে খেয়ে ওঠে, বাঁ হাতে মার কাঁধে হাত রেখে আঁচাতে যেতে যেতে মিষ্টি করে হেসে বলে, 'এবার তুমি সব ছেড়ে দাও ওর হাতে, দেখো ও সব পারবে।'

পাঁচ

সন্দীপন যদি অতো সরল না হতো, অত সংসার অনভিজ্ঞ না হতো তা হলে ঠিক বুঝতে পারতো তার মায়ের আসল সমস্যাটা কোথায়। কিছুটা বুদ্ধি করে চললে দেবযানীর জীবন তিনি হয়তো অতটা বিষময় করে তুলতেন না।

আগুন লাগিয়ে আপিসে চলে যায় সন্দীপন। সেই আগুনে দেবযানীকে পোড়ান হেমলতা। উনুনে জল ঢেলে খাবেন না বলে বসে থামেন, ডুকরে ডুকরে কাঁদেন। সে কান্না যে কতো দুঃখের বুঝতে পারেন দেবযানী। তিনি ভয় পান, শুকনো মুখে ঘুরতে থাকেন এঘর ওঘর। খিদেও পায়। সকালে তো খাওয়া হয়নি কিছু। সেই এক কাপ চা। সন্দীপন যতোক্ষণ না আপিসে যায় বাড়িতে যেন বিয়ে বাড়ি লেগে যায়। এটা দাও ওটা দাও সেটা দাও, সেটা কই—হুড়মুড় দুর্দার। সন্দীপন চ্যাচায়, মা চ্যাঁচান, অস্থির হয়ে রমেশের মা আকর বাকর করে। আর তার তো কোনো কাজই নেই। ছেলের কোনো কাজেই বৌয়ের হাত দেয়া পছন্দ করেন না হেমলতা। করতে গেলে বলেন, 'বড়ো পাকা মেয়ে তুমি। এই বয়সেই এই, তারপরে তো যা দেখছি সবই মুঠোয় পুরবে। একটু সবুর করো অন্তত।'

এ কথায় চোখে জল আসে দেবযানীর। শাশুড়ি কেন এমন নির্দয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না।

একদিন জ্বর হলো সন্দীপনের। এক বন্ধুর মৃত্যুতে সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো। বন্ধুটি হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা যায়। খবর পেয়েই ছুটেছিলো সেখানে, ফিরেছিলো একেবারে দাহ করে। ফিরে এসেই জ্বর। গায়ে হাত দিয়ে দেবযানীর বুকের ভিতর যেন সহস্র দামামা পিটতে লাগলো এমনি ভয় হোলো তার। তিনি বরাবর শুনে এসেছেন তাঁর জ্যাঠামশাই নাকি শ্মশান থেকে জ্বর নিয়ে ফিরে এসেই মারা যান। জ্যাঠাইমার বয়েস তখন সতেরো। বিয়ের এক বছরও পেরোইনি।

ছেলের জ্বর হয়েছে জানা মাত্রই হেমলতা সেই যে ঘরে এসে ঢুকলেন একবারের জন্যও দেবযানীকে কাছে এগুতে দিলেন না। সন্দীপন ছটফট করছে জ্বরের তাপে, স্ত্রীর জন্যও তার ছটফটানি কিছু কম নয়। ঘোরের মতো লাল লাল চোখে তাকাচ্ছে, ডাকছে। কিন্তু দেবযানীর যাবার উপায় নেই। হেমলতা খাট জুড়ে বসে আছেন মাথার কাছে। জলের পটি দিচ্ছেন, হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আদর করছেন গালে গাল ঠেকিয়ে আর অনবরত ফরমাশ করছেন তাঁকে এটা এনে দাও, ওটা নিয়ে এসো, সেটা রাখো। করুণ চোখে তাকিয়ে ফরমাশ খাটা আর দূরে দাঁড়িয়ে দেখা।

রাত হলো। চেয়ারে বসে বসে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিলো, হেমলতা বললেন, 'বসে আছো কেন? ওঘরে গিয়ে শোও। আমি আজ এখানে থাকবো।'

হঠাৎ চটকা ভেঙে উঠে বসলো সন্দীপন, ঘামছে কুলকুল করে। জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে তার। হেমলতা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'উঠলি কেন? শুয়ে থাক। ওষুধ ধরেছে।'

'রাত হয়েছে অনেক, না?'

'দশটা বাজলো। কিছু খাবি? খিদে পেয়েছে?'

'দেবযানী কোথায়?'

ছলছল চোখে এগিয়ে এলো দেবযানী। সন্দীপন হাত বাড়িয়ে হাত ধরলো, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

দেবযানীর মাথায় ঘোমটা, চোখ মাটিতে নিবদ্ধ। শাশুড়ির সামনে স্বামীর হাত ধরাটা তাঁর কাছে অন্যদিন নিশ্চয়ই খুব লজ্জার বলে মনে হতো। আজ বুক ঠেলে শুধু কান্না এলো সারাদিন বাদে এই উত্তপ্ত স্পর্শে।

হেমলতা রাগ করে বললেন, 'তোমাকে তো বললাম ওঘরে গিয়ে ঘুমোও। যা খাবে খেয়ে নাও। মিছিমিছি রমেশের মাকে বসিয়ে রেখে লাভ কী?'

অবাক হয়ে সন্দীপন বললো, 'কোন্ ঘরে গিয়ে শোবে ?'

'আমার ঘরে।'

'বা রে, আমি একা থাকবো নাকি ?'

'একা থাকবি কেন ? আমি তো আছি।'

'তুমি কেন থাকবে ? তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো তোমার ঘরে। খেয়ে এসো দেবযানী। আমি ভালো আছি। ও কি কাঁদছো কেন ? কী বোকা মেয়ে। মানুষের জ্বর হয় না ?'

সেই রাত্রে সেই অসুস্থ ছেলের শয্যাপার্শ্বে বসে হেমলতা যা কাণ্ড করলেন তার কোনো তুলনা নেই। কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে একেবারে মরাকান্না জুড়ে দিলেন। কটুভাষায় ছেলেকেও যা খুশি তাই বললেন, দেবযানীরও পিতৃপুরুষ উদ্ধার করলেন।

মায়ের রকম দেখে থ হয়ে গেল সন্দীপন। সে মাতৃনির্ভর ছেলে সেটা ঠিক কিন্তু এই মূর্তি তাকে চমকে দিলো। এক সময়ে বললো, 'কান্নাকাটি ঝগড়াঝাটি সব ওঘরে গিয়ে করো। দেবযানীর ঘুম পেয়েছে ওকে শুতে দাও।'

ছেলের এই ভয়ঙ্কর নির্ঘোষে সবেগে ঘর ত্যাগ করলেন তিনি। দেবযানী বেতস লতার মতো কাঁপতে লাগলেন। সন্দীপন তাঁকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলো দু'হাতে। চুম্বন করে বললো, 'আমি তো আছি, ভয় কী ?'

'না, ভয় আর কিসের ?' সারা দিনের সব ব্যাকুলতা ঢেলে তিনি স্বামীর সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগলেন। যুবক যুবতীর যুগলজীবনে আর দুঃখের জায়গা কোথায় ? সব দুঃখই কচুপাতায় জল।

কিন্তু সকালে শয্যাত্যাগ করে আর এ-ঘরে আসতে সাহস হয় না। শাশুড়ি তাকে মুখোমুখি এমন বকাবকি এই প্রথম করলেন। শাশুড়ি যে তাঁকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি এটা তো তিনি গোড়া থেকেই জানেন। তবে শাশুড়িরা যে অনেক সময়েই এরকম হয়·সে বিষয়েও

অনেক গল্প শোনা ছিলো তাঁর। মা বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি সহ্য করে যেয়ো, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাই উনি যাই করুন না কেন দেবযানীর মনের মধ্যে কোনো কালো দাগ পড়েনি। শাশুড়িদের পুত্রবধূ নিগ্রহের নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েই কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন কেমন একটা ঘৃণা হলো।

ঘৃণার জন্ম সেই প্রথম। শাশুড়িকে আর তাঁর শাশুড়ি মনে হলো না। সতীন মনে হলো। সন্দীপনের উপর হেমলতার পুত্রস্নেহের চেহারা তাঁর বিকৃত মনে হলো। অতি আদরে লালিত পালিত সভ্যশান্ত পরিবারের সভ্যশান্ত অতিমাত্রায় ভীরু এবং লাজুক মেয়েটির কোমল মুখটা সহসা কঠিন দেখালো। ভীত পদক্ষেপে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে পায়ে তাঁর বল এলো। রান্নাঘরে গিয়ে হেমলতার দরবারে উমেদারী না করেই তিনি স্বাধীনভাবে স্বামীর জন্য এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এলেন।

আজ হেমলতা চা নিয়ে অন্যদিনের মতো ঘরে ঢোকেন নি।

রমেশের মা উনুন ধরিয়ে জলের কেটলি চাপিয়ে বিপন্ন মুখে বসেছিলো, বৌদিকে চা করতে দেখে আশ্বস্ত হলো। ফিসফিসিয়ে বললো, 'মা জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন।'

'দেবযানী বললেন, কেন ?'

'চলে যাবেন।'

'কোথায় ?'

'আলিপুরে ভাইয়ের বাড়িতে।'

'সে কী !'

'তুমি দাদাবাবুকে বারণ করতে বলো। নৈলে লোকে বলবে যে বৌ আসতে আসতেই মাকে তাড়িয়ে দিলো।'

'মাকে তাড়িয়ে দিলো ?' ছি ছি কী লজ্জা! দেবযানী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কেটে ফেললেন।

ছয়

এরপর থেকেই ভয়ে ভয়ে থাকা, শাশুড়ির পায়ে পায়ে চলা, অবিশ্রান্ত মন যোগাবার চেষ্টা, এসবগুলো আর সহজভাবে করতে পারেন নি। একদিন জ্বর ভোগ করে পরদিনই ঝরঝরে হয়ে গেল সন্দীপন। হেমলতার রাগও চিরস্থায়ী হলো না, সংসার আবার চলতে লাগলো তার নিজস্ব গতিতে। কেবল দেবযানীর মনেই একটি বিষের কাঁটা ফুটে রইলো তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে। মাতৃত্বের আসন ধূলোয় লুটোলো।

হেমলতা যা করুন যাই করুন তিনি যে সন্দীপনের মা, তিনি যে সন্দীপনকে প্রাণতুল্য ভালোবাসেন একথা দেবযানী বিয়ে হয়ে থেকে এক মিনিটের জন্য ভুলে থাকেন নি। এই মাকে সুখী করতে হবে, এই মাকে যত্ন করতে হবে, এই মাকেই বাকী জীবন মা বলে মানতে হবে এই ছিলো তাঁর ধারণা। পিত্রালয়ের সংসারে তাঁর নিজের মাকে ঠাকুমা কাকিমা জ্যাঠাইমা সকলের সঙ্গেই সকলকে একাত্ম দেখে তাঁর অভ্যাস। আর মাত্র একজন শাশুড়িকে তিনি সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন না সেটা কখনো হয়? সে তো হেরে যাওয়া।

সন্দীপনের সঙ্গে এ নিয়ে তার অনেকদিন অনেক কথাও হয়েছে। নেহাৎ ছোটোখাটো ব্যাপারেও হেমলতা এমন উগ্র হয়ে উঠেছেন যে অশান্তির শেষ থাকেনি। যেমন, সন্দীপন আপিশ থেকে ফিরে এসে চা খেয়ে চানটান করে হঠাৎ বললো, এই চলো একটু বেড়িয়ে আসি। অমনি মা বাদ সাধবেন। দোষটা হয়তো দেবযানীরই। সন্দীপন বলামাত্রই দেবযানী চটপট বেরিয়ে যেতে পারেন নি স্বামীর সঙ্গে। শাশুড়ির পিছনে ঘুর ঘুর করেন। মিনতির গলায় বলেন, 'ও বলছে কোথায় বেরুবে, আমাকেও যেতে বলছে—।'

'যেতে বলছে যাও। আমি তার কী করবো।' গলায় ঝাঁঝ। অমনি ভীত হয়ে দেবযানী বলেছেন, 'আপনিও চলুন না।'

ও-ঘর থেকে সন্দীপন তাড়া লাগিয়েছে, 'মনি তোমার হলো? এসো, ভাখো, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চলো আজ লেকে যাই।'

দেবযানী খোলা দরজা দিয়ে একবার ও-ঘরে তাকিয়েছেন একবার এ-ঘরে। তারপর আবার বলেছেন, 'চলুন।' আস্তে হাত ধরেছেন, 'শাড়িটা বদলে নিন।'

তখনকার দিনকাল এমনিই ছিলো। স্বামীর বাড়ির সকলের মন যোগানো বিবাহের একটা শর্ত মেয়েদের জীবনে। তবে একথা বললেও সত্যের অপলাপ হবে, সবটাই দেবযানীর মন যোগানো ছিলো না। ভালোবাসা পাবার একটা আকুতি ছিলো। বাপের বাড়ির সব্বাইকে ফেলে এই ছোট্টো সংসারে এসে এই মাকে মা করে নিতে বড়ো সাধ হয়েছিলো তার।

এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়েই হয়তো তুমুল হয়ে গেল বাড়িতে। বৌ যেতে বললে কী হবে? ছেলে কি বলেছে? তাই নিয়ে কতো মান অভিমান কান্নাকাটি।

ঝগড়া তিনি বৌর সঙ্গে করেননি, করেছেন ছেলের সঙ্গে। বেড়াতে যাবার প্রস্তাব সেখানেই সমাধি লাভ করেছে। সন্দীপন স্ত্রীকে বলেছে, 'তুমি ওরকম করো কেন বলো তো?'

'কী বকম।'

'আমার সঙ্গে কোথাও একা যেতে কি তোমার ভালো লাগে না?'

'এটা কি একটা জিজ্ঞাসা করার বিষয়?'

'সব সময় মার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো যেন উনি ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন। বিশ্রী লাগে। আমি বলেছি যাবে ব্যস চলে আসবে।'

'মাকে জিজ্ঞেস করবো না?'

'জিজ্ঞেস করবার কী আছে? যাবার সময় বলে গেলেই তো হলো।'

'উনি রাগ করবেন।'

'অন্যায়ভাবে রাগ করলে সেটা সংশোধন করা দরকার।'

'না না ওরকম বোলোনা। কোথায় কোথায় মানুষের কতো আঘাত লাগে। উনি তো মা। আমাদের সেটা দেখা উচিত।'

'ডোণ্ট বি সিলি, ওরকম বৌপনা কোরোনাতো। আমার এসব

একটুও ভালো লাগে না। দিল্লীতে থেকেছো, বিলিতি স্কুলে পড়েছো, এসব গ্রাম্যতা শিখলে কোথায়? ঐ জন্যই তো আমি তোমার ঘোমটা দেবার বিরোধী ছিলাম। আমার কথা তো শোনো না, কেবল শাশুড়ির মনোরঞ্জন।'

দেবযানী হাসেন, 'তোমার কথা শুনলে সংসার চলে?'

'কেন চলেনা শুনি?'

'একসঙ্গে থাকতে গেলে কতকগুলো পারস্পরিক তার প্রশ্ন থাকে।'

'যথা?'

'তোমার মা যতোক্ষণ তোমার কাছে আছেন, তোমার স্ত্রী হয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করে কোনো কাজই আমি করতে পারি না।'

'আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুমতি না নেয়া কি তাঁকে অগ্রাহ্য করা?'

'তিনি যদি তা মনে করেন তা হলে নিশ্চয়ই তাই।'

'আমি বলবো এটা মার অন্যায় এবং ভালোমানুষ সেজে প্রশংসা কুড়োবার এই চেষ্টাও তোমার খুব সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।'

এ কথায় দুঃখ পান দেবযানী। বলেন, 'আমি প্রশংসা কুড়োবার চেষ্টা করি না। আমাকে কেউ কোনোদিন নিন্দে করেনি সেজন্য প্রশংসা যে চেয়ে পেতে হয় আমি তা জানিনা। কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের ভয়েই আমি সব সময়ে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করি। তা-ও তোমার কথা ভেবেই।'

'আমার কথা ভেবে কিছু করতে হবে না তোমাকে।'

'এ বাড়িতে আমার অস্তিত্বের মূল্য তো তুমিই।'

'এটা কী ধরনের কথা হলো? আমি কারো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হাত দিই না। আমার উপরও কেউ সেটা প্রয়োগ করুক তা-ও চাই না। তুমি স্বাধীনভাবে চলবে, সেটা কারো পছন্দ হয় হবে, না হয় হবে না।'

সন্দীপনের কাছ থেকে এই ছাড়পত্র পাবার পরেও কিন্তু দেবযানী

শাশুড়ীর পক্ষে অনেকগুলো কথা ভেবেছেন। প্রথমত ভদ্রমহিলা পুত্রগত প্রাণ, তার উপরে তিনি স্বামীহীনা, তারও উপরে তাঁর এই ছেলে ছাড়া যাবার আর কোনো জায়গা নেই। এতো দিন পুত্রও তো মাতাগত প্রাণ ছিলো. বিয়ে করেই একেবারে সব উল্টে যাবে এটা ভাবতে খুব খারাপ লাগে। নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। সেই চিরাচরিত শাশুড়ি বৌয়ের গল্প। ছি।

প্রশংসা কুড়োবার জন্য নয়, এই দুর্নামও তাঁর কল্পনায় অসহ্য যে তাঁরই জন্য মাতৃভক্ত সন্দীপন (যা এই পরিবারের মুখে মুখে) মাতৃবিরোধী হয়েছে বলে ধিকৃত হবে। তারচেয়ে একটু মন জুগিয়ে চললে যদি তিনি শান্ত থাকেন সেই তো ভালো। দেবযানী স্বাধীকারে চললে এ বাড়িতে যে প্রত্যেক দিনই একটি খণ্ডযুদ্ধ বাধবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

শুনেছেন তাঁর পিসিমার শাশুড়ও খুব রাগী ছিলেন। পিসিমাকে তিনি প্রথম জীবনে অশেষ কষ্ট দিয়েছেন। আমোদে আহ্লাদে ফুর্তিতে একেবারে টগবগে পিসিমা। হঠাৎ এই দুর্ব্যবহারে হকচকিয়ে গেলেও হাল ছাড়েননি। অন্যান্য বৌদের মত কান্নাকাটি ক'রে বাপের বাড়ি আসা আর স্বামীর কাছে নালিশে তিনি দিন কাটাননি. ধৈর্য-সহ্য আর সহিষ্ণুতার বিনিময়েই শান্তি এনে দিয়েছেন সংসারে।

সেই ধৈর্য সহ্য সহিষ্ণুতা তাঁর জীবনেও সকল বিরোধের অবসান ঘটাক এটাই ছিলো দেবযানীর আকাঙ্খা। সন্দীপনের চরিত্র পাঠ করে এটা তিনি বুঝেছেন, মা-ই হোক, বৌ-ই হোক, যাই হোক না কেন যেটা তার মাথায় অন্যায় বলে মনে হবে তার সঙ্গে আপোষ সে কক্ষনো করবে না। তাতে যদি হেমলতা গৃহত্যাগ করেন তবুও না।

এই কারণে এই মানুষকে অনেক সময় ব্যথার ব্যথী হিসেবেও কিছু বলতে দ্বিধা করেন। তা নইলে অনেক দিন অনেক কারণেই হেমলতা এমন আঘাত দিয়ে কথা বলেন যে চোখের জল রাখতে পারেন না। ইচ্ছে করে সন্দীপনের কাছে বলে নিজেকে লাঘব করেন। উপায় নেই।

অমনি রেগে যাবে।

হেমলতার এক বোনও আসেন মাঝে মাঝে। এই যে সন্দীপন বলে যে সে তার ঘোমটা দেবারও বিবোধী ছিলো, এই ঘোমটা নিয়ে সেই মাসিমা একদিন কতো কথা বললেন। ঘোমটা দিতে আগে আগে সত্যি তাঁর অসুবিধে হতো। কখন যে পড়ে যেতো বুঝতেই পারতেন না। একদিন মাসিমা এলেন, দেবযানী খাবার ঘরে বসে বসে শাশুড়ির জন্য খই বাছছিলেন। খুশি হয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। মাসিমা, হাসির বদলে হাসলেন না, খরদৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'শোনো দেবযানী, কতোগুলো শিক্ষাদীক্ষা মেয়েরা তাদের বাপের বাড়ি থেকেই জেনে আসে। মায়েরাই শিখিয়ে দেয়। তা মনে হচ্ছে আদিনাথ তালুকদারের স্ত্রী সেই আচার আচরণ কিছুই তাঁর মেয়েকে শিখিয়ে দিতে পারেননি' শ্বশুরবাড়িতে কোনো গুরুজনকে দেখেও যে তোমার মাথায় ঘোমটা তুলে দেবার কথা খেয়াল হলো না এটা গুরুজনকে অসম্মান করা ছাড়া আব কিছু নয়।'

চমকিত হয়ে দেবযানী ঘোমটা তুলতে তুলতে বললেন, 'ও।'

শাশুড়ি বেরিয়ে এলেন, 'এবার ফ্রকটা পরলেই আজকালকার মেয়েদের সব ঝামেলা চোকে।'

শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মাসিমা তেমনিই চোখ টান রেখে বললেন, 'তুমিও একটু শিক্ষা-দীক্ষা দিও, লাজলজ্জা হলো গিয়ে মেয়েদের অঙ্গের ভূষণ, খোকাকেও বলিহারী যাই—'

খোকা হচ্ছে সন্দীপন। খোকাকে কেন বলিহারী যান সেটা শোনা গেল না। কান ঝাঁ ঝাঁ করছিলো, চোখ জলে ভরে গিয়েছিলো।

সাত

চোখ জলে ভরে যাওয়া অবশ্য নতুন নয়। বলা যায় প্রত্যহই একবার এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তিতে তাঁর শ্রবণ মন ধন্য হয়। সন্দীপনের বাড়ি থাকার মেয়াদ খুব কম। একে তো আপিসে গাধার খাটুনি, তার উপরে ছবি আঁকার কাজ নিয়েছে অনেক। অর্থোপার্জনেব জন্য বেচারার আর বিশ্রাম নেই। এ নিয়েও হেমলতা কম ক্রুদ্ধ নন। এ-ও যে বৌয়ের জন্য তা নিয়েও ছেলের সঙ্গে গোলমাল লেগেই আছে তাঁব। মন্দের ভালো এই, মোকাবিলাটা তিনি সব সময়ে ছেলের সঙ্গেই করেন। বলতে থাকেন এইজন্যই তিনি বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন। এখন বৌর গোলামী করতে প্রাণ যাবার দশা। সন্দীপন চলে গেলে বলেন, 'মা তো ঝি বৈ আর কিছু নয়? বৌ হ'লো গিয়ে অন্য কথা। তাকে যে করে হোক সুখে রাখতেই হবে কারণ গলায় রক্ত উঠে মরলেও তো বৌ নিস্তার দেবে না। তার শাড়ি চাই, গয়না চাই, থিয়েটার সিনেমা, ফিটনে চড়ে সান্ধ্য ভ্রমণ, সবই তো চাই। নৈলে যে ময়না পাখি ফুরুৎ করে উড়ে অন্য খাঁচায় গিয়ে বসবে।'

হেমলতার বোন বলেন, 'তা যা বলেছো। বুঝলে দিদি মা হচ্ছে কম্বল। তাকে পেতেই শোও আর গায়েই জড়াও সে সুখে-দুখে তোমারই অধীন। আর বৌ? সে যে বেনারসী শাড়ী গো। তোয়ালে জড়িয়ে ন্যাপথোলীন দিয়ে আলমারিতে তুলে না রাখলে পোকায় কাটবে।'

•

এসব কথা তাঁদের অনেক দুপুরের বিশ্রাম্ভালাপ। সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া পড়ে, দেবযানী তাড়াতাড়ি রমেশের মার সাহায্যে লুচি ভাজেন বেগুন ভাজেন যত্ন করে চা করে দেন দুই শাশুড়িকে, এঘর ওঘর করতে করতে এসব শোনেন। ওঁরা চা খান, লুচি খান, রমেশের মা বলে, 'বৌদি তুমিও খাওনা দুখানা গরম গরম।' দেবযানী জিব কাটেন। রান্নাঘরে বসে একা একা লুচি খাবেন কী? ছি ছি। সে যে প্রায় চুরি

করে খাবার মতো। এমনিতেই খাওয়া বিষয়ে তাঁর ভারি লজ্জা, হাতে ধরে দিলেই চোখ নিচু। না,না লাগবে না এই হচ্ছে তাঁর বুলি। তার মধ্যে রান্নাঘরে বসে কারো বিনা অনুরোধে নিজেরটা নিজে নিয়ে খাবেন তার চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে ?

শেষ পর্যন্ত বেচারার খাওয়াই হয় না। না সকালে, না বিকেলে।

সন্দীপনের বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে যায়। এসেই হাতের ঘড়ি, পকেটের কলম, আঁকার কাগজপত্র রাখতে রাখতে চেঁচিয়ে বলে, 'উঃ মরে গেলাম, শীগ্‌গীর চা —' বলেই বাথরুমে ঢোকে। হাত ধোয় ডেটল দিয়ে সাবান দিয়ে। সক্রিয় হয়ে ওঠেন হেমলতা, দৌড়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান, অনর্গল বকাবকি করতে থাকেন রমেশের মাকে, ছেলের খাবার তৈরী হয়।

সংসারের অন্য কাজের জন্য দেবযানাকে তিনি সব সময়েই নিযুক্ত রাখেন বটে কিন্তু ছেলেব যা কিছু সব তাঁর। হাতে কলমে নয়, রমেশের মাকে দিয়ে। তাঁর নির্দেশ মতোই রমেশের মা প্লেট সাজায়, কেটলির জল টি পটে ঢালে, ট্রে সুদ্ধ চা এনে টেবিলে রাখে।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সন্দীপন চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, 'আঃ।' বৌর দিকে তাকায় 'এসো এসো আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' মায়ের দিকে তাকায় 'মনিকে দিলে না ?' মা বলেন, 'দেবোনা কেন ? তুই খা না, বৌ তো আর না খেয়ে নেই, আমাদের তো সাড়ে চারটার মধ্যেই চা খাওয়া হয়।"

কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা রমেশের মা মিনমিন করে বলে, 'বৌদি তো খাননি। দাদাবাবুর সঙ্গে খেয়ে নিননা বৌদি।'

হেমলতা তার দিকে ফিরে তাকান, আদেশের সুরে বলেন, 'নিজের কাজে যাও।'

সন্দীপন খেয়ালই করে না। খাওয়াটা উপভোগ করতে করতে

সারাদিনের সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকে মাকে বৌকে। দেবযানীর আর রুটিতে মাখন লাগানো হয় না, অথবা গরম ভাজা কচুরিতে দাঁত বসানো হয় না অথবা ফুলকো লুচিতে বেগুন ভাজা জড়ানো হয় না। অর্থাৎ যেদিন যেরকম খাবার হয় তা কোনোটাই তিনি নিজের জন্য নিজে গ্রহণ করতে পারেন না। শাশুড়ি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের পিঠ ঘেঁষে, প্রখর দৃষ্টিতে দেখছেন সব।

সকালেও ঐ একই অবস্থা। রোববার ছাড়া ব্রেকফাস্ট বলে তো আর কিছু হয় না, তাড়াতাড়ি নাকেমুখে ভাত গুঁজে সন্দীপনকে ন'টার মধ্যেই রওনা হতে হয় আপিশের জন্য। ব্রেকফাস্ট আর করবে কখন? সাতটার সময়ে এক কাপ চা আর দুটি হান্টলি পামারের বিস্কুটেই প্রাতঃরাশের সমাপ্তি।

তারপরই 'দাও দাও গেঞ্জি দাও। পাঞ্জাবীটা কই? রুমাল? ঘড়ি চিরুণী? মা, পয়সা দাও।'

আবার ঐ পয়সা নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা মায়ের সঙ্গে। মা বলেন, 'এব বেশী নিলে কী করে সংসার চলবে?'

সন্দীপন বলে, 'বারে, আমার কিছু খেতে হবে না ক্যান্টিনে?'

'কতো টাকা তুমি দাও আমার হাতে যে যা চাও তাই দিতে পারি? বিয়ে করতে কি আমি বলেছিলাম?'

সন্দীপন রেগে যায়, 'ঐ এক রোগ তোমার? সব কিছুর মধ্যেই ঐ এক কথাই টেনে আনো। কেন, টাকাকড়ি নিয়ে খিটিমিটি করার স্বভাব কি তোমার আজকের নাকি? না কি অভাবের মুখও তুমি এই প্রথম দেখছো? দেবযানীকে নিয়েই তোমার যতো জ্বলুনি। আচ্ছা মা, তুমি তো আমাকে খুব ভালোবাসো, আর আমি যাকে ভালোবাসি তাকে তুমি একটুও ভালোবাসতে পারোনা? এ কী অদ্ভুত মনোবৃত্তি তোমার?'

হেমলতার গলা গর্জে ওঠে, টাকার ব্যাগটা তিনি ছুঁড়ে দেন ছেলের

দিকে, পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলেন, 'তোর টাকা যদি আমি ছুঁই, আমার নামে কুকুর পুষিস।'

সন্দীপনের দেরি করার সময় নেই, দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সে। দ্রুত নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। দেবযানী আকুল নয়নে তাকিয়ে থাকেন, সন্দীপনও ফিরে তাকায়, হাত নাড়ে। চোখে চোখে স্ত্রীকে ভালোবাসা জানায়।

এই সব দুঃখই হয়তো মিটে যেতো একদিন। পিসির মতোই ধৈর্য সহ্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে শাশুড়ির সমস্ত বিরাগ একদিন তিনি ধুয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু সেই রাতের সেই ঘৃণার কণ্টকটিই তাঁর হৃদয়েব মোড় ঘুরিয়ে দিল।

শাশুড়িকে সতীন ভাবা নিশ্চয়ই অপরাধ। শাশুড়ির প্রতি এই অশ্রদ্ধা নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য নয়, কিন্তু মন মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পরে বয়েস হয়ে গেলে শাশুড়ির মৃত্যুর পরে অনেক দিনই ভেবেছেন কেন সেদিন সন্দীপনের জ্বর হলো, কেন সারাদিন স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার অন্তর অমন বিপরীত হয়ে গেল শাশুড়ির দিকে।

এই বৈপরীত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিজের কাছে সেদিনই প্রকট হয়ে উঠলো যেদিন মাকে একটা চিঠি লিখে হঠাৎ খেয়াল হলো তাঁর কাছে একটা দু আনা টিকিটের পয়সাও থাকে না।

কোনোদিনই তো থাকে না। বিবাহের এই এক বছরের মধ্যে তিনি এই নিয়মই তো দেখে এসেছেন যা যখন প্রয়োজন চাইতে হবে শাশুড়ির কাছে। মাইনে পেয়ে সন্দীপন সবটাই ধরে মায়ের হাতে এনে দেয়, দরকার মতো চেয়ে চেয়ে নেয়। দরকার তার বড়ো একটা হয়ও না অবশ্য। সিগারেট খায়, মাকে বললে মা পয়সা দেন রমেশের মা এনে দেয়। তেমনি দাড়ি কামাবার সাবান, গায়ের সাবান, ব্লেড আরো টুকি-টাকি যা লাগে তা-ও রমেশের মা এনে দেয়। আর হাট বাজার এসবের সঙ্গে তো সম্পর্কই নেই কোনো। আপিসে যাবার সময় মা গুণে গুণে

পয়সা দেন, বেশীর ভাগ দিনই তাই নিয়ে ঝগড়া বাধে।

আগেও হয়তো বাধতো, তার কী কারণ ঠিক জানেন না দেবযানী, এখন জানেন। প্রায়ই মার কাছ থেকে বেশী টাকা নিয়ে গিয়ে নানা ধরনের ছোটো খাটো উপহার আনে দেবযানীর জন্য। যেমন: দামী রুমাল, অসম্ভব দামের কোনো সেণ্ট, চিঠিলেখার বিলিতি কাগজ খাম,— খুব ভালোবাসে এসব আনতে। নিজের জন্য সে হাতে করে কোনোদিন কিছু না কিনলে কী হবে এই কেনার মধ্যে তার আর সুখের সীমা নেই।

আর এইসব উপহার দেবযানীকে স্বর্গের নন্দনকাননে নিয়ে যায়। সন্দীপন গোপনতা জানে না, চালাকি জানে না, দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই সরবে ঘোষণা করে, 'মনি, দ্যাখো, তোমার জন্য আজ কী এনেছি।'

দেবযানীর বুকে বিদ্যুৎ চমকায়, দুই চোখে আলো ঝলসে ওঠে তারপরেই রমেশের মার ইঙ্গিতে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বুকের বিদ্যুৎ হিম হয়ে যায়। মাথায় কাপড় টেনে চুপচাপ থমকে দাঁড়ায়।

'জানো, এসপ্ল্যানেডে এসে দেখি একটা লোক চাকাওলা টেবিলে করে কী সুন্দর সুন্দর সব মনোহারী জিনিস নিয়ে ঘুরছে—' বলতে বলতে স্ত্রীকে স্পর্শ করে শোবার ঘরে নিয়ে আসে হাতে ধরে। পকেট থেকে উপহার বার করে দিতে দিতে শেষ করে কথা।

অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে হেমলতা বারুদের মতো জ্বলে ওঠেন।

এই অশান্তি নিয়েই তো চলছিলো দিন, তবু তো দেবযানী শাশুড়ির বিরুদ্ধে একটা কথা দন্তস্ফুট করেননি স্বামীর কাছে, কোনো বিদ্বেষ বিতৃষ্ণার ধোঁয়ায় ধূমায়িত হননি। সব সময়েই ভেবেছেন ঠিক হয়ে যাবে। সব সময়েই ভেবেছেন সন্দীপনকে যিনি অত ভালোবাসেন, সন্দীপন যাকে অত ভালোবাসে তাদের মধ্যে যেন তিনি কোনো বিরোধের সৃষ্টি না করেন। বাধা না হয়ে দাঁড়ান।

সেই সুমতি তাকে ত্যাগ করলো সেদিন। একটা চিঠি লেখার পয়সাও কেন তার হাতে দেয়না সন্দীপন, সেই প্রথম মনে মনে ভীষণ রাগ হলো তাঁর। সন্দীপন আপিস থেকে ফিরে এলে নিভৃত হয়ে বললেন, 'আমি বালিকাও নই, এ বাড়ির মেয়েও নই। প্রত্যেক পদক্ষেপে অন্যের মায়ের মুখাপেক্ষী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, সম্মানজনকও নয়।' অবাক হয়ে সন্দীপন বললো, 'কী হয়েছে? মা কিছু বলেছে?'

'প্রায় এক বছব হতে চললো আমাদের বিয়ে হয়েছে, তুমি আমাকে কতোটুকু ছ্যাখো? কী করো? কেবল নিজে নিজেবটা হাতে হাতে পেলেই তুষ্ট। কিন্তু আমি তো তোমাকে নির্ভর কবেই এ বাড়িতে এসেছি?'

স্ত্রীর এই ক্ষুব্ধতায় সন্দীপন বিচলিত হলো। চুপ কবে থেকে বললো, 'বুঝতে পেবেছি মা তোমাকে অত্যন্তই উত্যক্ত করেছে, কী হয়েছে বলো।'

'কিছু হয়নি।'

'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

'না। যদি হয়ও তাহলে তুমি কী করবে?'

'মা'র সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।'

'তার চেয়ে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া হলে কি বেশী ভালো হয় না?'

'তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া? তোমার সঙ্গে আবার কিসের বোঝাপড়া?'

'যেমন আমার যখন যা দরকার তুমি দেবে, আমি তোমার কাছে চেয়ে নেবো।'

'কিন্তু আমার কাছে তো কোনো পয়সা কড়ি থাকে না। ওসব একেবারেই মায়ের ডিপার্টমেণ্ট, আমি সংসারের কোনো ঝামেলায় আসতেই ভালোবাসি না। বল না তুমি কী চাও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত চেপে দেবযানী বললেন, 'শাড়ি চাই, গয়না চাই, থিয়েটারে যেতে চাই, সিনেমায় যেতে চাই, আর চাই ছ'আনা পয়সা, একটা ডাকটিকিটের দাম।'

আট

বৃথা। বৃথা। এই মানুষকে কিছু বোঝানো বৃথা।

কয়েকদিন ধরে ভারি শরীর খারাপ চলছিলো। এরকম কখনো হয়নি। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, খাবার নাম শুনলেও বমি আসে। শুধু মা বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতে। অসময়ে শুয়ে থাকবেন, তা-ও লজ্জা শাশুড়ির কাছে। সন্দীপন অস্থির হয়ে গেল। চেঁচিয়ে, মাথায় করলো বাড়ি, 'মা, ওমা, দেবযানীর কী ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছে দেখছো না? তোমার সেই কে চেনা ডাক্তার আছে—'

হেমলতা গম্ভীর, 'ডাক্তার দিয়ে কী হবে?'

'কী আবার হবে? দেখবে এসে।'

'কী দেখবে?'

'কী দেখবে মানে?' সন্দীপন চটে গেল, 'বাড়িতে একটা হাঁচ কাসি হলে তুমি ডাক্তার ডাক্তার করে অস্থির হয়ে যাও, আর এই বেলা জিজ্ঞেস করছো কী দেখবে। ঠিক আছে আমিই খুঁজে ডাক্তার আনতে পারবো। দরকার নেই তোমার ভাইয়ের চেনা ডাক্তারে।'

দেবযানীর কোনো বাধা নিষেধ না মেনে বেরিয়ে গেল সে। দেবযানী লজ্জায় অধোবদন। হেমলতা মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'আদিখ্যেতা আর কাকে বলে। ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে। বিয়ের তো মাত্র ছ' বছরও পোরেনি, এর মধ্যেই বাঁধিয়ে বসেছে। ওস্তাদ মেয়ে।'

কী বাঁধিয়ে বসেছেন বুঝতে পারলেন না দেবযানী। কিন্তু আর সকলেই বুঝলো। ডাক্তার এসে তো বুবলেনই, কাকা কাকিমাও

বুঝলেন, হেমলতা যে আগেই বুঝেছিলেন সেটাও বোঝা গেল।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন বাবা। নিয়ে যাবেন মেয়েকে। এইরকম সময়ে অন্তত প্রথম কয়েক মাস মা'র কাছে থাকাই ভালো। সন্দীপনেব খুব মন খাবাপ। স্ত্রীকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন কবে? দেবযানীবও কি কম মন খারাপ। তিনি আবদাব ধবলেন, 'ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলো।'

তাই হলো শেষ পর্যন্ত। দু' সপ্তাহের ছুটি নিল সন্দীপন। যাওয়াটা খুব আনন্দের হলো।

বিবাহেব পবে এই তাঁব দ্বিতীয়বাব পিত্রালয়ে আগমন। সাবা বাড়িতে যেন উৎসবেব বন্যা লেগে গেল। অরুণাও সঙ্গে এসেছে এই আনন্দে যোগ দিতে। সাবাদিন সন্দীপনেব পিছনে লাগছে। সন্দীপনকে তাব ভাবি পছন্দ। ভাইয়েবা বোনেরা মা বাবা জ্যাঠাইমা সবাই মিলে একটা একটানা খুশিব স্রোতে ভাসতে লাগলো। পনেরোটা দিন পনেরো মিনিটে কাটিয়ে স্ত্রীকে রেখে ম্লান মুখে ফিরে গেল সন্দীপন। দেবযানীর মুখও ম্লান হলো। কিন্তু তার মেয়াদ দীর্ঘ হলো না। সকলের আদরে যত্নে ভালোবাসায় পূর্বজীবনের স্বাদ ফিরে এলো, কতোকাল পরে এই পরিবেশ অচিরেই তার মনের সকল দুর্বলতা কাটিয়ে সবল করে তুললো।

স্বামীর গৃহে তিনিই সকলকে আদর যত্ন করেন। বাড়ির লোক তো বটেই, অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু সকলের সেবাতেই তাঁকে মনোযোগ দিতে হয়। সন্দীপন তার নিজস্ব কাজের বাইরে আর কোনো ক্ষেত্রে একবিন্দুও সময় দিতে রাজী নয়, কাজেই তার সকল কর্তব্যের দায়দায়িত্ব পরিশ্রম এভাবে তাঁর একার ঘাড়েই পড়ে। তার উপরে শাশুড়ি বিমুখ। তাঁর মন যোগানোও বড়ো সহজ কথা নয়। যদিও পূর্বের ভয় ভক্তি ভালোবাসা শ্রদ্ধা কিছুই আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই এই

দুই বছরে তবুও সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো এই নীতি অনুসরণ করে চলতে গিয়ে ঠোক্কর তো খেতেই হয় ?

আশ্চর্য ! এতোদিনেও হেমলতা পুত্রবধূর উপর এতোটুকু সদয় হতে পারেননি। মানুষের তো একটা অভ্যাসও হয় ? তা-ও হয়নি। তবে তফাৎ হয়েছে অনেকখানি। অন্তত এটুকু বুঝেছেন ছেলের জীবন থেকে এই আপদ উচ্ছেদ করা আর সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় তাঁর স্ত্রৈণ পুত্রটি একটি মেষশাবক ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রীর মেষ। তাই এখন আর ভোর না হতে ছেলের যুগল জীবনে মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো গিয়ে দাঁড়ান না তার ঘরে। শোবার আগে দেবযানী যখন আস্তে দরজাটা বন্ধ করে আলো নেবান, লাথি দিয়ে সেই দরজাও খুলে দেন না। ছেলের কোনো কাজে হাত দিলেই যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতেন, সেটাও অন্তর্হিত বরং বৌয়ের উপর সমস্ত কাজের ভার চাপিয়ে বেশ আরামের সঙ্গেই স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। ছেলের ঝামেলা তো কম নয় তাঁর। অধিকার ছাড়তে চান না বলেই কষ্ট হলেও করেন। অধিকার যখন ছাড়তেই হলো তখন আর আরামে বাধা কোথায় ?

যদিও এসবের প্রত্যেক পদক্ষেপেই অনেক অশান্তির ইতিহাস নিহিত আছে। সন্দীপন বলেছিলো, 'ভোর পাঁচটা তো সাংঘাতিক সকাল। আমি কি তখন উঠি নাকি ? অত সকালে আর আমাকে চা নিয়ে ডেকো না। যখন খাবো, দেবযানীই এনে দেবে। আর নয়তো রমেশের মা-ই দিয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপতন হয়েছিলো। হেমলতা সখেদে সরবে রাগে বিরাগে ক্রন্দনে স্বরগ্রাম উচ্চে তুলে এক অস্বাভাবিক কাণ্ড কারখানা করলেন। ঝড়ঝঞ্ঝাট সামলাতে দেবযানীর প্রাণান্ত। তখনো অবশ্য শাশুড়ির প্রতি মনোভাব তাঁর ততোটা কঠিন ছিলো না, তখনো চেষ্টা ছিলো একটা বোঝাপড়ার, একটা সন্ধিতে পৌঁছুবার। তখনো তিনি মন থেকে এই অনুভূতিটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেন নি যে ইনিই তাঁর

স্বামীর প্রাণদায়িনী, এঁর শুশ্রূষার দ্বারাই সন্দীপনের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁচেছে। হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে সেই ছেলেকে তাঁর মা'র সান্নিধ্য থেকে কীভাবে তিনি সরিয়ে নেবেন? কর্ম হেমলতার, কিন্তু ফললাভ করবেন দেবযানী? না সেটা হয় না।

কিন্তু দরজা বন্ধের ব্যাপারটা তাঁর সব সৎবুদ্ধির ভিৎই নাড়িয়ে দিল। কোনো এক রাত্রে মনকে যথেষ্ট শক্ত এবং দৃঢ় করে নিয়েই তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই হেমলতা লাথি মেরে খুলে দিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা ছবির বই দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাওয়া সন্দীপন চমকে উঠে বলেছিলো, 'কী হলো?'

অভ্যাসবশত প্রথমটা দেবযানী ভয় পেয়ে এ কাজটা অন্যায় হয়েছে ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সাব্যস্ত করলেন নিজেকে। যে ঘরে তিনি থাকবেন সে ঘরে নিভৃত হবার এই সামান্য অধিকারটা যদি তাঁর না থাকে তাহলে তো বলতে হবে এখানে বাস করারই কোনো অধিকার নেই। একটা হোটেলে মেসে থাকলেও তো মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। তবে তিনি সন্দীপনের স্ত্রী হয়ে সন্দীপনের বাড়িতে সেটা পাবেন না কেন?

শুতে এসেও না শুয়ে স্থিরভাবে গিয়ে চেয়ারে বসলেন। দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় সন্দীপনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার মনে হয় এ বাড়িতে আমি অতিথি হয়ে আসিনি, অংশীদার হয়েই এসেছি।'

'সে তো নিশ্চয়ই। তা হঠাৎ একথা কেন?'

'পশুদেরই প্রাইভেসির কোনো বালাই থাকে না, মনুষ্য নামক জীবেরই সেটা সমস্যা।'

'মেনে নিলাম, তারপর?'

'এভাবে দরজা খোলা ঘরে আমার পক্ষে শোওয়া অসম্ভব।'

তাকিয়ে থাকলো সন্দীপন। স্ত্রীর এই চেহারাটা তার অচেনা। অল্প পরে উঠে বসে ফস করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে

ধরাতে বললো, 'ও, পাড়াপ্রতিবেশীকে সচকিত করে তাই এই জেহাদ ঘোষণা?'

দেবযানী মাথা নেড়ে বললেন, 'না। পাড়াপ্রতিবেশীকে জানিয়ে জেহাদ ঘোষণাও আমি প্রাইভেসির অন্তর্গত বলে ভাবি না।'

'তবে কি ঐ নিষ্প্রাণ দরজাটার উপর বোমা ফাটিয়ে আমাকে সচেতন করলে?'

'তোমাকে সচেতন করতে গেলে মনে হয় এসব স্থূল পদ্ধতিই প্রযোজ্য। কিন্তু যে যা পারে না তা পারে না! সুতরাং তা-ও আমি করিনি। আমি দরজাটা ভেজিয়েছিলাম—তারই এই সশব্দ প্রতিবাদ। আমি ধরে নিয়েছি তোমার মা এই লাথি ঐ নিষ্প্রাণ দরজাকে দেননি? আমাকেই দিয়েছেন।'

সন্দীপন স্ত্রীর এই ধরনের ভাষণেও বিস্মিত হলো। যতো সংযত-ভাবেই হোক এটা ঝড়েরই সংকেত। নালিশেরই রূপান্তর। ঠিক এই মনোভাব মা-ও ব্যক্ত করেন সারাদিন। চেহারাটা ভদ্রপোষাকে সজ্জিত নয়, একান্তই উলঙ্গ। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতোদিন এক পক্ষেরই ছিলো, এখন দেখা যাচ্ছে পারস্পরিক।

এতোদিন মাকেই তার বোঝাতে হয়েছে যা তিনি করেন তা সঙ্গত নয়, শোভন নয়, সুবিচারও নয়।

হেমলতা সরোষে বলেছেন, 'যা যা, বৌর হয়ে আর মোক্তারি করিস না। যে মেয়ে পুরুষ মজিয়ে বিয়ে করে তাকে আমি চরিত্রহীন বলি।'

সন্দীপন লাল হয়ে উচ্চারণ করেছে, 'ছ্ ছী!'

হেমলতার রোষ তাতে একবিন্দু দমিত হয় না, নিজের বক্তব্যের জের টেনে বলেছেন, 'তুই বা এই তক্তার মতো মেয়েটাকে কী বলে পছন্দ করলি? যে মেয়েটাকে ছবি আঁকা শেখাতি সেটা হলেও না হয় বুঝতাম একটা শরীর আছে।'

মায়ের এই অশালীন উক্তিতে দাঁতে কাঁমড় পড়েছে সন্দীপনের। সে ক্রুদ্ধ হয়েছে। আহত হয়েছে। রাগকে অবদমিত করে পথে বেরিয়ে

গিয়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি। মা বিষয়ে ভালোবাসা তার অন্ধ। কিন্তু এরপরে বাক্যালাপেও প্রবৃত্তি হয়নি। এবং সেটাই মায়ের এই অহেতুক শত্রুতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু মা-ই তো? আবার ভুলেও গেছে। আজ স্ত্রীর মধ্যেও সেই স্বভাবের কাঠিন্য এবং বৈরী ভাব দেখে শুধু অবাকই হলো না। দুঃখিতও হলো। বিছানা ছেড়ে উঠে এসে হাত রাখলো তাঁর পিঠের উপরে। অসহায় ভাবে বললো, 'আমার সব শান্তি কেড়ে নিও না। তুমি তো তুমি। তুমি কেন আমার মায়ের সমতলে নেমে এলে?'

ঢোঁক গিলে দেবযানী বললেন, 'যুদ্ধ করতে নামিনি। যা অন্যায়, যা কুৎসিত তার প্রতিবাদ না করাও এক ধরনের অন্যায় বলে মনে হচ্ছে।'

'এতোদিন যদি দরজা খুলে রেখে শুতে পেরেছো, তখন আজ তোমার এই জেদ হলো কেন?'

'দরজাটা ভেজিয়ে দেয়াতে কোনো জেদের প্রশ্ন ছিলো না। তবে খুলে রেখে শোওয়ার মধ্যেও আমার কোনোদিন মেনে নেবার কোনো প্রশ্ন ছিলো না। সেটা আমার প্রাত্যহিক অস্বীকাব। আমি আজ সেটাই তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'তার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে?'

'তার অর্থ এই যে দরজা বন্ধ না করতে পারলে আমি এ ঘরে শোবো না।'

'আমার কাল সকাল না হ'তে আপিস, রাত এখন প্রায় এগারোটা। তুমি খুব ভালো করেই জানো, এর ফলে মা কী বাজে ধরনের ব্যবহার করবেন।'

'তুমি কি জানো না, সেই ব্যবহার মা আর ছেলের সম্পর্কের মধ্যে মানায় না?'

'মানায় কি মানায় না সে প্রশ্ন অবান্তর।'

'কেন? অবান্তর কেন?'

'আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে শাশুড়িরা বৌকে নির্যাতন করতে চিরকালই সিদ্ধহস্ত।'

'অতএব সেটা চলতেই থাকবে।'

'না। আমি গোড়া থেকেই তার বিরোধী ছিলাম। মনে করে দেখতে পারো, তোমাব সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকা, মন যোগানো মেনে নেয়া ইত্যাদি বৌগিরি কখনোই পছন্দ করিনি—'

'তা হলে নতুন মানুষ আমি এ বাড়িতে এসে কী করতাম? ঝগড়া?'

'দরকার হলে করতে। আমার তাতে কিছু বলবার ছিলো না।'

'তাতে তোমার শান্তি বিঘ্নিত হতো না?'

'যদি আমার সুখ শান্তিব কথা ভেবেই সব কাজ করে থাকো, তা হলে আজই বা তার ব্যতিক্রম কবছো কেন?'

দেবযানী চুপ করে থাকলেন। বলতে পারলেন না, 'তোমাদের মা আর ছেলের ভালোবাসার মধ্যে আমি আব কোনো পবিত্রতা দেখতে পাই না। তোমার মা তোমাকে পুত্রের মতো যতোটা দেখেন, অজানিত-ভাবে প্রেমিকার আসনেও তিনি ততোটাই আসক্ত।'

বলা কি যায়? এটা কি একটা কথা? এরকম কি কখনো সম্ভব? কিন্তু তবু এই অভিজ্ঞানই দেবযানীর অন্তরে বিষের ক্রিয়া করে। তিনি আর সহ্য করতে পারেন না হেমলতার এই সতীনসুলভ আচরণ। স্বামীস্ত্রী দরজা বন্ধ করে শোবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। বাড়িতে আর কেউ না থাকে সেটা আলাদা কথা কিন্তু শাশুড়ির মতো একজন গুরুস্থানীয় যেখানে উপস্থিত, দু'টি ঘরে যেখানে মাত্রই একটি তিন ইঞ্চির দেয়ালের ব্যবধান, সেই দুই ঘরের মাঝখানে মস্ত দরজাটি এরকম পর্দাবিহীন ভাবে খুলে রেখে একলা শুতেও তো বাঁধো বাঁধো ঠেকে। তার মধ্যে দু'টি যুবকযুবতী, যাদের মধ্যে প্রেমের নতুন ঢেউ কুলপ্লাবী, তারা কী করে শোবে?

নয়

সব মানুষই পথিক। পথ চলতেই এসেছে। এর পরে তো এক কোলেই সকলের ঠাঁই। ক'টা বা দিন। এরই মধ্যে কত কাণ্ড।

সেই অল্প বয়সের দেবযানী এখন বেশী বয়সে উত্তীর্ণ হয়ে সেকথা ভেবে অবাক হলেন। শাশুড়ির কথা ভেবে দুঃখ পেলেন। আহা! মানুষটা আর সুখী হতে পারলো না জীবনে। অথচ জীবনের যা মূলধন তা তিনি মন্দ পাননি। স্বামী অকালমৃত হলেও মাতৃবৎসল পুত্রটি তাঁর বুক জুড়ে ছিলো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগ্য হয়েছিলো, বিবাহ করে একটি ভদ্রমেয়েকেই তো এনে দিয়েছিলো কাছে, যে মেয়েব মনে একবিন্দু দ্বিধা বা গ্লানি ছিলো না তাঁকে মা বলে গ্রহণ করতে। চেষ্টারও কোনো ত্রুটি করেনি। তবু হলো না। কেন হলো না? কোন্ অলক্ষ্য শত্রু মানুষের জীবন নিয়ে এমন মরণ খেলা খেলে?

সন্দীপনের সঙ্গে দেবযানীর সেই রাত্রে আরো অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছিল, যা সুখপ্রদ নয়।

সব শেষে সন্দীপন বলেছিলো, 'যদি ধরো এই দরজা বন্ধ ব্যাপারটা মার একটা পাগলামীই হয় তাহলে কী করা যাবে? প্রতি রাত্রে ঝগড়া করবে?'

দেবযানী বলেছিলেন, 'পুত্রের দাম্পত্যজীবন যদি তার মায়ের পাগলামীর উপর নির্ভরশীল হয়, আমি বলবো সেই পুত্রের তার মাকে নিয়েই শুধু বাস করা উচিত ছিলো। বিবাহ করা উচিত হয়নি।'

রেগে গিয়ে সন্দীপন বলেছিলো, 'তার মানে তুমি কি চাও যে মাকে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই।'

কী হৃদয়হীন! এমন একটা কথা সন্দীপন বলতে পারলো তাকে? মুখে আর তার কথা সরলো না। সন্দীপন তো মূঢ় নয়, কে কাকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর তা সে নিশ্চয়ই বোঝে। মনের অগোচরে পাপ নেই। দেবযানী নিজেকে যাচাই করে দেখেছেন, সহিষ্ণুতার অগ্নি-

পরীক্ষায় যদি তিনি পাশ করতে না পারতেন তাহলে এবাড়িতে একই পাটাতনে তার স্ত্রী ও মা কখনোই সহাবস্থান করতে পারতো না। একজনকে সরতেই হতো। হেমলতা সমস্ত দিন ধরে সরবে নীরবে আভাসে ইঙ্গিতে যে নির্যাতনের চাষ করেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে ঠাট্টা-টিটকিরি বিদ্রুপের যে বাণে জর্জরিত করেন, তার সবটা সন্দীপনের শ্রবণ ধন্য না করলেও কিছুটা করে। না কি সেগুলো সে তার মায়ের প্রতিক্রিয়ার হিসেবে ধরে নেয়। অথবা অগ্রাহ্য করে। অথবা হাওয়ায় সাঁতার কেটে নিজেকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে চায়?

দুটি ঘরের মধ্যে মাত্রই তিন ইঞ্চি একটি পার্টিশন ওয়াল, তার উপরে দরজাটি হাঁ করে খোলা, সুতরাং তারা খুব মৃদু স্বরেই কথা বলছিলেন। তাই বলতে হয়। গলা খুলে কথা বলা কী বস্তু ভুলেই গেছেন দেবযানী। শুধু তো রাত্রিবেলাই নয়, দিনের বেলাতেও সব কথাই শাশুড়ির কান বাঁচিয়ে বলা। এমনিতেই তিনি দিল্লীর মেয়ে, বেহায়া হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, তার উপরে ইংরিজি স্কুলে পড়েছেন, একেবারে সোনায় সোহাগা। এই দুটি প্রচণ্ড অপরাধ নিয়ে সর্বদাই জড়োসড়ো। জোরে জোরে স্বামীর সঙ্গে কথা বললে তো উপায়ই নেই।

সন্দীপন অবশ্য এসব কিছু বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। স্ত্রীর সন্ত্রস্তভাব তার পছন্দও নয়। মা কি ভাবলেন না ভাবলেন এ নিয়ে বিব্রত হওয়ায়ও তার ঘোর আপত্তি। স্পষ্টই বলে, 'তুমি স্বাভাবিক হতে পারোনা কেন? মা কী করবেন? কেটে তো আর ফেলবেন না? বড়ো জোর রাগ করবেন। করুন। করতে দাও। আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

তার উত্তরে দেবযানীর বলা উচিত, 'মানুষ শুধু তলোয়ার দিয়েই কাটে না, কথার ধারও তলোয়ারের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। সন্দীপন একবার বেরিয়ে যাকনা বাড়ি থেকে, তারপর তিনি কী তুমুল করেন তা

আর কেউ না দেখুন ঈশ্বর দেখবেন। রমেশের মাও দেখে অবশ্য। কিন্তু বলেন না। বিশ্রি লাগে। মনে হয় নালিশ করছেন, মায়ের বিরুদ্ধে লাগিয়ে তাদের এতোদিনের সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। তার চেয়ে একটু মানিয়ে মন জুগিয়ে চললে যদি শান্তি বজায় থাকে, তাই থাকুক। রুচি প্রবৃত্তিতেও আটকায়, ভাবতেই পারেন না আপিশ থেকে একজন কর্মক্লান্ত মানুষকে ফিরে আসা মাত্রই সংসারের সমস্ত দিনের সমস্ত গ্লানির খবর ঢেলে মলিন করে দেবেন।

অভিমানেও আটকায়। আসলে সেটাই হয়তো বড়ো সত্য। সন্দীপনের কি উচিত নয় স্ত্রীর বিষয়ে আর একটু মনোযোগী হওয়া। সে তো সংসারের হাল জানে। কোপন স্বভাব মায়ের চরিত্র জানে। দেবযানীর মনে অভিমানের সঙ্গে অভিযোগও জমা হয়। স্বামী প্রেমিক নয়, স্বামীর কাছে মেয়েদের পাওনার তালিকাটা অন্য রকম। বিবাহের দ্বারা একজন পুরুষ একজন মেয়েকে কী ভাবে উপড়ে নিয়ে আসে তার নিজস্ব গৃহ থেকে, তার পরিচিত পরিবেশ থেকে, পিতামাতা পরিজনের সাহচর্য থেকে। ঐ একটি মানুষকে অবলম্বন করেই তো চলে আসে সে? তার কেমন লাগছে, কেমন আছে, কী খাচ্ছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা এসব জিজ্ঞাসারও একটা প্রশ্ন থাকে সেখানে। স্বজন বিচ্ছেদের দুঃখের সঙ্গে অন্য কোনো দুঃখ যাতে যুক্ত না হয় দেখতে হয় সেটা। বড্ড ছোটো কথা। কিন্তু সেই ছোটোই অনেক সময় অনেক বৃহৎ বেদনা বয়ে আনে।

সন্দীপনের মা যদি দেবযানীকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতেন হয়তো এতো কথা মনে হতো না। তা তো তিনি করেননি। ভদ্রতা করেও একদিন সস্নেহে কথা বলেননি। সন্দীপন খুব ভালো করে জানে কী ভয়ঙ্কর এক বিরূপ মানুষের কাছে সে সারাদিনের জন্য রেখে যায় তার স্ত্রীকে। কিন্তু ফিরে এসে কোনোদিন কি কিছু জিজ্ঞেস করেছে? করেনি। ঝামেলার ভয়েই করেনি।

সন্দীপন এও খুব ভালো করে জানে তার স্ত্রী স্বভাবতই একটু ভীতু

প্রকৃতির। ঝগড়া বিবাদ মুখে মুখে তর্ক এগুলোতে রপ্ত নয়। তবে? আর তারও পরে আজ সে এই কথা বললো যে, 'তুমি কি চাও, মাকে আমি বাড়ি থেকে বার করে দিই?'

এ কথার মানে কি এটাই দাঁড়ায় না তোমার কথা মতো তো আমি মাকে অনেক কষ্টই দিয়ে থাকি, বাকি আছে শুধু বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া।

বুক ফেটে গিয়েছিলো দেবযানীর। হাতে হাত চেপে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উদ্গত কান্নাকে ভিতরে পাঠাবার চেষ্টায় শরীরটা তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। দূরের দিকে তাকিয়ে বোকা মেয়েব মতো মনে মনে বললেন, 'মা, বাবু, তোমরা কোথায়? তোমবা আমাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আমি আর পারছি না।' আব সেই সময়েই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে সন্দীপন বলেছিলো, 'আমি সব জানি, সব জানি, কিন্তু কী যে করবো সেটাই শুধু জানি না।'

একদিন কোনো বোববারের দুপুরে সন্দীপন বললো, 'এই, তুমি ছবি আকা ছেড়ে দিলে কেন? তোমার কাকার সঙ্গে দেখা হলো, তিনি খুব বকে দিতে বলেছেন এজন্য।'

সাগ্রহে দেবযানী বললেন, 'চলো না আজ সন্ধ্যায় এলগিন রোডে যাই। কতোদিন দেখা হয় না ওদের সঙ্গে।'

'আমি তোমার জন্য কাগজ পেনসিল রঙ তুলি সব এনে দেবো।'

'দূর। ও সব আমি ভুলে গেছি। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। তুমি আঁকছো তাইতেই হবে আমার।'

'হবে না। যার যার বিদ্যা তার তার হাতে, যার যার বুদ্ধি তার তার মাথায়। এতো আর কাপড়চোপড়ের মতো নিত্য বস্তু নয় যে একের বস্ত্র অপরে পরিধান করতে পারে।'

'অনিত্যতে বাসনা নেই আমার। আর আমি ছবি আঁকা ধরলাম

কবে যে ছেড়ে দিলাম। কাকা বকে দিতে বলেছেন? আজ গিয়ে কাকাকেই আমি বকে দেব। অরুণাকে এখনই কেন বিয়ে দিতে চাইছেন। তা নিয়েও আমার রাগারাগি করবার আছে।'

হঠাৎ অভিমান আহত গলায় সন্দীপন বললেন, 'তাইতো। নিজে বিয়ে করেই তো বেশ ভালোভাবে বুঝেছ অসুখী হওয়া কাকে বলে। এক্ষেত্রে বোনের বিয়েতে বাধা দেয়া তো উচিতই।'

'যা বলেছো।' দেবযানী হাসলেন, 'তোমার মতো বেরসিক সত্যবাদী না হলেও, সত্যের অপলাপ না করেই বলতে পাবি একথাটা আমার তোমার কাছ থেকেই ধার করা।'

'আমি আবার একথা কবে বললাম?'

'তুমি বলেছো, মেয়েরা ইকনমিকেলি ইনডিপেনডেণ্ট নয় বলেই তাদের এই দুরবস্থা। ছেলেবা লেখাপড়া করুক না করুক, মেয়েদের অন্তত বি-এ পাশের আগে বিয়ে দেয়া কখনোই উচিত নয়। ছেলেরা দরকার মতো কুলিগিরি করেও খেতে পারে। মেয়েদের সসম্মানে বেঁচে থাকার একমাত্র পেশাই হচ্ছে মাস্টারি। সুতরাং অরুণাকে যেন তোমার কাকা পরীক্ষার কাছাকাছি এনে বিয়ে, বিয়ে করে পাগল না করেন।'

এইবার সন্দীপন অমলিনভাবে হেসে বললো, 'এমন ব্যক্তিত্বশালিনী স্ত্রী আমার, সে যে আবার অন্যের কথা ধার করে বলছে বুঝবো কী করে?'

এসব কথার অনেক পরে লজ্জা লজ্জা মুখে সন্দীপন জানালো, সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটা পোস্টার কম্পিটিশন হয়েছিলো, তাতে সে ফার্স্ট হয়েছে।

এই খবরে স্থান কাল পাত্র ভুলে দেবযানী কতোকাল পর তাঁর কুমারী অবস্থার মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, 'সত্যি? সত্যি?'

হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিল সন্দীপন, 'তোমার স্বামীকে ঐটুকু মর্যাদাতেই বাহাবা দিও না দয়া করে। একটা পোস্টার কম্পিটিশনে

জয়ী হওয়া তার পক্ষে সুখের কিছু নয়। আমি কি শেষে একটা পোস্টার আঁকা চিত্রকর বলেই খ্যাতিলাভ করবো? এর পরের কম্পিটিশন করছে ক্যালেণ্ডার। ভারতবর্ষ, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক আর হল্যাণ্ড।'

'সত্যি।'

'অস্থির হয়ো না। সেটাও কিছু গৌরবের নয়। তবে সেখানে প্রথম হলে একটা লাভ হবে, যেহেতু আমার ফার্ম ওলন্দাজদের দ্বারা পরিচালিত সেই জন্য হল্যাণ্ড পাঠাতে পারে। রেমব্রাণ্টের দেশ। ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এসো, তোমাকে তার বিষয়ে বলি। যদি পাঠায়ই তাহলে আমি আমস্টারডাম যাবো। সেখানে জানতো, খালে নৌকো বাঁধা থাকে। সেই নৌকো করে কয়েক মাইল গেলে তাঁর বাড়ি, সেখানে সব অরিজিনাল পেইনটিং—মনি, ভাবতেও আমার কেমন লাগছে।'

ছবি বিষয়ে কথা শুরু হলে সন্দীপন থামতে পারে না। আসলে সেটাই তার আসল অস্তিত্ব, আসল প্রাণ। অথচ যে ছবি সে আঁকতে চায় তার সঙ্গে চাকরির সর্ত মেলে কই? বেচারা। ভীষণ দুঃখ হয় দেবযানীর।

হয়তো সেই দুঃখ থেকেই দেবযানী আবার তার ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। বিয়ের আগে বেশ ভালো আঁকতেন বলেই নাম ছিলো তাঁর। চমৎকার পোর্ট্রেইট আঁকতে শিখিয়েছিলেন তাঁর মাস্টারমশাই পীতম কাউর। পীতম কাউর দিল্লীতে পোর্ট্রেইট আঁকার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর কাছে দেবযানী তিনটি পোর্ট্রেইট এঁকেছিলেন। একটা তাঁর দাদুর, একটা মায়ের, আর একটা ছোট ভাইয়ের। তিনটেই খুব প্রশংসা পেয়েছিলো। দৃশ্যও আঁকতেন আর আঁকতেন ডালা কুলো পিঁড়ি। দিল্লীতে কোনো বাঙালী ছেলেমেয়ের বিয়ে হলেই ডাক পড়তো তাঁর এই কাজের জন্য। বাঙালী হিন্দু বিয়েতে আলপনা চাই-ই চাই। এই আলপনায় সেখানে দেবযানীর জুড়ি ছিলো না।

দেবযানী ভেবেছিলেন আজেবাজে আঁকার কাজগুলো করে তিনিও যদি কিছু উপার্জন কবতে পারেন, অথবা সন্দীপনের কাজে সাহায্য করে তাঁকে যদি কিছু সময় দিতে পারেন, তাহলে সেই সময়টা সন্দীপন নিজের মনোমতো কাজে ব্যয় করতে পারবে। সন্দীপন বাড়িতে অনেক কাজ নিয়ে আসতো। বেশিব ভাগই লেটারিং আর রঙ ভরাট করা। যে কাজ দেবযানীর পক্ষে করে দেয়া খুব কঠিন নয়।

এই সময়েই দেবযানীর শরীর খারাপ হলো। চিঠি লিখে কাকা-কাকিমাই দিল্লীতে মা-বাবাকে খববটা জানিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নিয়ে চলে এলেন বাবা।

'বুঝলেন মিসেস মিত্র—' হেমলতার সঙ্গে আলাপ করেন তিনি। 'মনি আমাদের বড়ো আদরের। ওকে ছাড়া আমরা থাকবো একথা আগে ভাবতেই পারতাম না। ওকে ছাড়া বাড়ি আমাদের অন্ধকাব। আমার স্ত্রী তো এখনো পর্যন্ত অভ্যেস করে নিতে পারেননি। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন সববাই ভালোবাসতো ওকে। ওর জন্য আমাব বাড়ি সব সময়েই ভবা। হাসি গল্প গান হৈচৈ—'

'হ্যাঁ। হৈচৈটাই শিখিয়েছেন বেশী। তার বদলে একটু কাজে কর্মে মন দিতে শেখালে ভালো হতো।' হেমলতা তাঁব পুত্রেব শ্বশুরের মুখোমুখি চেয়ারে বেশ সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতেই বসেছিল। এই কটি কথা বলে তিনি পা নাচাতে লাগলেন।

'আমার বাবা বলতেন—' হেমলতার কথায় তিনি কান দেননি। নিজের কথাতেই মশগুল 'আমার নাতনী যার ঘরে যাবে তাদের ঘরই আলোয় ভরে দেবে। ভাগ্যও আছে। বিয়ের ছ'মাস পুরতে না পুরতেই দেখুন কতো বেশী মাইনেতে নতুন চাকরিটা পেয়ে গেল সন্দীপন। ও যখন জন্মালো আমার সংসারে তখন রীতিমতো অন্নবস্ত্রের টান। বাবা ছবি এঁকে সামান্য রোজগার করেন, প্রিয়নাথ ইস্কুল মাস্টার, আমি কেরানী। কিন্তু মুখ অনেক। সেই একই বছরের মধ্যে আমি সান-লাইফে একটা বেশ বড়ো পোস্টে ঢুকে গেলাম, প্রিয় বিজ্ঞাপনের

আপিসে। রাতারাতি বদলে গেল অবস্থা। যেন ভোজবাজি।'

হেমলতা তার বাবার এই প্রগলভতায় সম্ভবত অতিষ্ঠ হয়ে বেশ রুষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন।

একটু থতোমতো খেয়ে গেলেন বাবা, সবিনয়ে বললেন, 'আপনার যত্নটত্ন করে তো?'

হেমলতা একথা জবাব দেবার যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন না। শুধু মুখে একটা বাঁকা হাসি লটকে দিলেন।

বাবা বললেন, 'নিয়ে যাচ্ছি বলে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো? আমার স্ত্রী বলেছিলেন, সন্দীপনের মা তো ওরও মা। তিনি তো তাঁর একমাত্র পুত্রবধূকে নিশ্চয়ই কতো যত্ন করেন। তবু-মানে-আর কি—খাওয়া-দাওয়ায় ওর বড়ো লজ্জা কিনা। আর এই সময়ে—'

বাবাকে প্রার্থীর মতো দেখাচ্ছিলো। হেমলতা এইবার স্পষ্টভাবে বললেন, 'খাওয়া দাওয়ার লজ্জা? কই আমি তো কোনোদিন দেখিনি।'

এ কথায় চমকে উঠেছিলেন দেবযানী। কবে হেমলতা তাকে খেতে দেখেছেন? বিবাহের এই দু' বছরের মধ্যে প্রথম দু' চার দিন বাদ দিয়ে একদিনও কি দেবযানী সকালের আহার গ্রহণ করেছেন? বৈকালিক চায়ে হেমলতা যখন দাঁড়িয়ে থেকে 'এটা নে ওটা নে' বলে নিত্য নতুন জলখাবার পরিবেশন করেছেন ছেলেকে, একদিনও কি দেবযানীকে দিয়েছেন তার অংশ? দেবযানীও কি নিজে থেকে কখনো তা স্পর্শ করেছেন? তিনি বেশ ভালো করেই দেখেছেন এককাপ চা ছাড়া আর কিছুই দেবযানী খাননি।

সকালবেলাটায় প্রত্যেক দিনই একটা হট্টগোল। যতোক্ষণ সন্দীপন আপিসে না যায় কারো যেন নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। সন্দীপন ওঠে সাড়ে সাতটা নাগাদ। চা খেতে না খেতেই তো ছুটতে হয় বাথরুমে। দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া, দাড়ি কামানো ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য সেরে ঝুপ-ঝুপিয়ে স্নান করে আসতে আসতেই ঘড়ি ন'টার কাঁটা ছুঁই ছুঁই।

'দাও দাও, শীগ্‌গির ভাত দাও, কই এখনো টেবিলে আনোনি?' মাথা মুছতে মুছতেই সে চ্যাঁচাতে থাকে।

দশ

যাকে সাড়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হয়, তার জন্য ছ'টা থেকেই আয়োজনপর্ব চালানো উচিত। রমেশের মা ওঠেও সকালে। অনায়াসেই উনুনে আঁচ দিয়ে বাজারে চলে যেতে পারে। অথবা ডাল ভাত করে দৌড়ে গিয়ে মাছ নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। হেমলতা বলবেন, অত সকালে আঁচ দিলে অনেক কয়লা পোড়ে, কাজেই বাজার থেকে এসে আঁচ দিতে হবে। সকালের চা স্টোভে হয়। সেটা এখন দেবযানী করেন। যখন হেমলতাব তদারকিতে রমেশের মা করে দিত আর তিনি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেন তখন কিন্তু সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই উনুন না ধরালে রমেশের মার যাকে বলে গুষ্টিব পিণ্ডি চটকানো তাই করে ছাড়তেন।

ঘোমটা টেনে সে কাঁদতে বসতো। মেদিনীপুরের মেয়ে, মেদিনীপুরের বউ, দারিদ্র্যের জ্বালায় কার সঙ্গে কবে ভাসতে ভাসতে কলকাতা মহানগরীতে এসে পৌঁছেই এখানে কাজ পেয়ে গিয়েছিলো। হাজার অতিষ্ঠ হলেও যে অন্যত্র কোথাও কাজ খুঁজে নেয়া যায় তা সে জানতো না। তার চোখে সব সময়ই ভয়। যদিও নাম তার রমেশের মা, সেই রমেশ তার আর ইহজগতে নেই, শুধু নামটাই আছে। স্বামী আবার বিয়ে করেছে, তাকে খেতে দেয় না। কিন্তু খাওয়া ছাড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না। অতএব আত্মীয় পরিজনদের লুকিয়ে দু'মুঠো ভাতের জন্যই এসেছে এখানে। শুধু তো ভাতই নয়, তার উপরে আবার মাইনেও তিন টাকা। এ ভাগ্য সে কোথায় রাখবে ভেবে পায়নি। তাই এই সব বকুনি খেয়ে কান্না পেলেও রাগ করে সে চলে যায় না। যেতে জানে না।

উনুন না ধরাতে দেয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে হেমলতার। সন্দীপন ঠিক সময়ে ঠিকটি হাতের কাছে না পেলে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। রমেশের মা সাত সকালে উঠে উনুন ধরিয়ে জল ফুটিয়ে টি-পটের মধ্যে চা পাতা দিয়ে সব ঠিক করে রেখে দেবে আর দেবযানী এসে সাজানো জিনিস হাতে করে নিয়ে গিয়ে নাম কিনবে, তা তিনি কখনোই হতে দেবেন না। স্বামীর কোলে শুয়ে না থেকে সকাল সকাল উঠুক, এসে স্টোভ ধরাক, জল ফুটাক, তবে না চা— ?

তিনি চা করে নিয়ে গেলে, 'দেবযানী শুয়ে থাকতে পারে না', বউয়ের হ'য়ে এমন একটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কথা কী করে যে তাঁর ছেলে সেদিন উচ্চারণ করেছিলো সে কথা ভাবলে বোধ হয় মাথায় আগুন জ্ব'লে যায়। নানা রকম অসুবিধের সৃষ্টি করে তাই ছেলেকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে চান।

ঐজন্য বাজারে পাঠাতেও বেশ খানিকটা গড়িমসি করেন। বাজার নিয়ে ফিরবে, উনুন ধরাবে, মাছ কুটবে, ডাল সেদ্ধ করবে, ভাত নামাবে, সময় তো কম লাগে না ? তবুও এতো উর্ধ্বশ্বাস হয়তো হতো না। যদি না তারপরেও হেমলতা কর্তৃত্বের রশিটা নিজের হাতে ধরে থাকতেন। হাত লাগান না, লাগাম লাগান। এক মাছ সাতবার ধোয়াবেন, সাতবার কোটাবেন, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কেবলি বলতে থাকবেন, 'এর নাম কাজ ? হুঁঃ। এর নাম চাল ধোয়া ? হুঁঃ। এর নাম মাছ ধোয়া ? হুঁঃ। আরে বাবা, আলুর খোসাটাও ছাড়াতে শেখেনি ? হুঁঃ।'

অবিশ্রান্ত এই শুনতে শুনতে তারা দুটি প্রাণী, তিনি আর রমেশের মা কেবলি হুচোট খান। ভুল করেন, দেরী করেন। সন্দীপন খাবার আসেনি দেখে রাগ করে, না খেয়ে চলে যেতে চায়। হেমলতা খুশি হন। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে ঝটপট সব এনে দেন টেবিলে, ভুরু কুঁচকে বলেন, 'নে আয়। প্রত্যেক দিনের কাজ প্রত্যেক দিনই এই

বিশৃঙ্খলা। জানিনা বাপু, এই একহাতেই তো এতোকাল সব ছবির মতো করে এসেছি।

তা নিশ্চয়ই করেছেন। রান্নাটা তো তাঁরই হাতে ছিলো! কাছেই বাজার, যতোক্ষণে রমেশের মা দৌড়ে গিয়ে মাছ নিয়ে এসেছে ততোক্ষণে গনগনে উনুনে ডাল ভাত তৈরী। মাছ এলো আর কুটে ধুয়ে কড়াইতে উঠলো। একজন মানুষের দু'খানা মাছ নামাতে আর কতোক্ষণ। অনেক দিন রমেশের মা বলে, 'বাজারের টাকাটা তুমি বউদি কাল সাঁজ-বেলাতেই চেয়ে রেখো, সক্কাল হতেই আমাকে পয়সা দিও, আমি গিয়ে মাছ নিয়ে আসবো। তবে আর এ রকম বকাবকি ঝকাঝকি গোলমাল কিচ্ছু হবে না।'

দেবযানী বলেন, 'তুমি তো সব বোঝো রমেশের মা। আমি চাইতে পারি না। তাব চেয়ে তুমিই একটু তাড়াতাড়ি যাবার জন্য তাগাদা দিও।'

'তা কি দেইনা বউদি? দেই। মা কিছুতেই টাকা বার করেন না। বলেন, মুখটাও ধুতে দিবি না? তারপর বলেন, পুজোটাও করতে দিবি না। তখন যদি বলি উনুনটা ধরিয়ে দি তা হলে? অমনি রেগে যান। বলেন, 'কয়লা ফুরোলে টাকা দেবে কে শুনি? টাকা কি আমি গড়াবো, যা দিয়ে যা করি সে তা শুধু আমিই জানি, তানারা তো তাদের ফুটুনি নিয়েই আছেন।'

সন্দীপন কাজে বেরিয়ে গেলে তারপর সকালের প্রাতঃকালীন আহার। রমেশের মাকে মুড়ি গুড় দেন হেমলতা, সে গাল ভরে ভরে চিবোয়। তিনি নিজে কোনোদিন পরোটা আলুভাজা খান, কোনোদিন লুচি হালুয়া, কোনোদিন পাঁউরুটি। দেবযানীকেও কি দেন না? দেন। দেবযানীর হাতে দেন না বা বলেন না খাও। গুণে গুণে সেই খাবারই বিকেলে ছেলের জন্য তুলে রেখে, দেবযানীরটা রমেশের মার হাতে দিয়ে বলেন, 'খোকারটা যেন কম পড়ে না, ওটা যেন আবার কেউ ধরে না।'

দেবযানীর খিদে পায়, কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি থাকে না। আর এখন তো না খাওয়াটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

দুপুরের খাওয়াটা অবশ্য অনেক স্বাধীনভাবে খেতে পারেন। ঐ সময়টায় হেমলতা নিজে খেয়ে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে যান। রমেশের মা তখন দেবযানীকে যত্ন করে সব দেয়, সব সাধে, না নিতে চাইলেও শোনে না, ঢেলে দেয়। রমেশের মার যত্ন ভালোবাসা তাঁর সেই অনাদৃত জীবনে অনেক অভাববোধকে তৃপ্তি দিয়েছে।

যখন বয়েস বেড়েছে, শাশুড়ির নিগড় থেকে বেরুতে পেরেছেন, ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে অভাবে দৈন্যে স্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে অশান্তিতে ঘর করতে করতে যথেষ্ট পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন, কম খোঁটা দেননি সন্দীপনকে। মাঝে মাঝে চাপা অভিমান তাঁর উথলে উঠেছে। সুযোগ পেলেই বলেছেন, আমার সুখ-দুঃখের দিকে তুমি আবার কবে তাকিয়েছো? নিজেরটা ঠিক হলেই হলো।

সন্দীপন ছবি আঁকতে আঁকতে মুখ না তুলেই বলেছে, 'দেখার কী ছিলো? তোমার বাড়ি ঘর, তুমি কীভাবে থাকবে খাবে চলবে সে তো তোমারি নিজের ব্যাপার।'

'আমার বাড়ি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কি এ বাড়িতে জন্মেছি? আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম। বাড়িটা ছিলো তোমার আর তোমার মার। তুমি আমাকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছিলে। আমি আমার অস্তিত্ব ব্যক্তিত্ব সব সমর্পণ করেছিলাম তোমাকে। কিন্তু তুমি তোমার কোনো দায়িত্ব পালন করোনি।'

'আর কী কী করিনি, বলে যাও একটা একটা করে। মুখস্তই তো।'

'শুধু মুখস্তই না, অন্তরস্থও। তুমি কি মনে করো সারা সকাল খিদের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আমি তোমার মাকে দায়ী করেছি? না। তোমাকে দায়ী করেছি। তোমার উপরেই আমার রাগ হয়েছে।'

'সে তো ভালোই জানি'। সন্দীপন মৃদু হেসে সিগারেট ধরায়। 'কানেও শুনছি বছর ভরে। কিন্তু তুমিও তো জানতে আমার আপিস নামে একটা জায়গা ছিলো, যেখানে না গেলে শুধু তোমার নয় কারো আহারই জুটতো না। কী করে জানবো তুমি খেয়েছো কি খাও নি।'

'জানা উচিত ছিলো। অন্তত এটা তো জানতে যে তোমার মা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন নি—'

'তাতে কী হলো?'

'এবং সংসারের উনিই কর্ত্রী—'

'বেশ তো।'

'যিনি পারলে আমাকে বিষ খাওয়ান, সেই কর্ত্রীর হাতে সম্পূর্ণভাবে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে তোমার কি কখনো দ্বিধা হতো না? একবারো ভাবতে না সারাটা দিন আমার কীভাবে কাটে? কী খাই, কী করি সেটা কি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো না?'

'ও সব আমার খেয়াল-টেয়াল হতো না।'

'তোমার এই খেয়ালহীনতা আমি খুশির সঙ্গেই মেনে নিতাম, যদি নিজের বিষয়েও তুমি অন্যমনস্ক থাকতে। তোমার সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে অন্যরা করে দেবে আর তুমি সব বিষয়ে অন্যদের প্রতি উদাসীন থাকবে সেটা ক্ষমার যোগ্য নয়।'

'তাতো হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি। বক্তব্য শেষ?'

'না।'

'তবে বলে যাও বলে যাও, যা মনে আছে বার করে ফ্যালো।'

'যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথাই বলবো না।'

গাঢ় অভিমানে দেবযানী কক্ষ ত্যাগ করেছেন। ইচ্ছে করেছে কাজ ভুলে পিছনে পিছনে উঠে আসুক সন্দীপন, বলুক, 'সত্যি সেটা আমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে, সেজন্য এখন আমি অনুতপ্ত, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তা বলবে না। ওসব সাধ্যসাধনার মধ্যে সে নেই। অন্যের মন বোঝার চেয়ে নিজের কাজ তার অনেক বড়ো, সব মনোযোগ তার

সেইখানেই নিবেদিত। হয়তো এই নিষ্ঠুরতাই প্রতিভার ধর্ম, সাফল্যের চাবিকাঠি। তবু মন মানে না।

এগার

অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় যে তিন মাস তিনি পিত্রালয়ে কাটিয়ে এলেন ফিরে এসে দেখলেন পত্নীর বিরহে নিতান্তই কাতর হয়ে পড়েছে সন্দীপন। বুকটা ভরে গেল। হেমলতা ভেবেছিলেন এই সুযোগে তাঁর বোকা এবং স্ত্রৈন পুত্রটিকে আবার কিছুটা সজুত করে তুলতে পারবেন। ভেবেছিলেন তাঁর স্নেহে যত্নে আবার সে স্ত্রীর পরিবর্তে মাকে নির্ভর করেই ভব সমুদ্রে সাঁতার কাটবে। তা হলো না। বউ ফিরে আসাতে ছেলের আনন্দে আবেগে ডগোমগো চেহারার দিকে তাকিয়ে ক্রোধে হতাশায় তাঁর চোখে নতুন আগুন ধকধক করলো। নতুন কষ্টে তিনি আক্রান্ত হলেন। এবং এই ভয়ঙ্কর শত্রুর জন্য নতুন শাস্তি উদ্ভাবনে তৎপর হলেন।

রান্নাঘরের যে কর্তৃত্বটা প্রায় তাঁর আর রমেশের মার হাতেই এসে গিয়েছিলো। সেখানেই আবার দড়ি টানলেন তিনি। এবং বাড়িতে পা দিয়ে একবেলাতেই দেবযানী বুঝতে পারলেন আবার সেই অশান্তি উদ্বেগ ব্যস্ততা পরাধীনতার বেড়ি। অথচ উনি হাত গুটিয়ে নেয়াতে মোটামুটি স্বাধীনভাবেই এই দায়িত্ব বহন করতে পারছিলেন দেবযানী। এখন দেখা গেলো রমেশের মা সব সময়ে আবার ত্রস্ত হরিণী। ঘোমটার তলায় অশ্রুসজল চোখে ফিসফিস করে জানালো, 'তুমি এসে বাঁচলাম বউদি। মা সারাদিন বকাবকি করেন। আমার একদিনও আর থাকতে ইচ্ছে করে না। কাল থেকে রান্নার ভারটা আবার তুমি নিয়ে নিয়ো।'

দেবযানী বললেন, 'তা তো নেবোই। মার বয়েস হয়েছে, পারবেন বা কেন?' মুখে বললেন বটে কিন্তু মন বললো সেটা কার্যকরী

হবে না।

তাই হলো। হেমলতা স্বগতোক্তি করলেন, 'অন্যের হাতে খেয়ে ছেলে আমার আধখানা হয়ে গেছে। কোনোদিন কি এমন রোগা ছিলো? পেটই যদি না ভরলো তবে পুষ্টি হবে কী করে? আমি এতোদিন দেখিনি, ক্ষতি হয়েছে আমারই। যা মাছ আনা হয় তা যদি ভাগ করে খায় কেউ তবে ওর পাতে কী পড়বে?' এই বলে ছেলের রান্নাও করে দেন, কাঁসারির মাছও একটা একটা করে প্রায় সব তুলে দেন পাতে। সন্দীপন পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে চলে যায় আপিসে। আর হেমলতা সেই উনুন নিয়ে ঢোকেন নিজের ঘরে। বলেন, 'আমার রান্না সেরে তোমাদের দেব, তখন তোমরা তোমাদেরটা করে নিও।'

সন্দীপনের ডাল তরকারিতে রুচি কম, মাছই তার প্রধান খাদ্য। হেমলতা এক মুঠো ধোঁয়াওঠা ভাত আর তিন-চার টুকরো মাছ দিয়ে ছেলের বিবাহের আগে যেমন দিতেন তেমনিই রান্না ধরেছেন। তাতে ভীষণ মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। হেমলতা উনুন না ছাড়লে আর দেবযানীদেরটা হচ্ছে না। বেলা হয়ে যাচ্ছে অনেক। হেমলতা স্নান করে পূজোআর্চা সেরে তার পরে রান্না করেন। ততক্ষণ কয়লা পুড়তে থাকে, আবার কয়লা দিতে হয়, সেই সময়টার মধ্যে অন্তত ভাতটাও যদি হয়ে থাকতো, কিছু সেদ্ধটেদ্ধ দিয়ে খেয়ে নিতে পারতেন দেবযানী আর রমেশের মা। সেটা তিনি দেবেন না। ছেলেরটা হলেই উনুন তাঁর। দেড়টা দুটোর সময় প্রায় নিভন্ত উনুনটি যখন তিনি ফেরৎ দেন তখন তাতে আগুন তুলে রান্না বসাতে বসাতে খিদেতে নেতিয়ে যান দেবযানী, রমেশের মা-ও কম কাতর হয় না।

রমেশের মা মধ্যে মধ্যে সাহস করে বলে, 'মা, বউদি এই প্রথম পোয়াতি মানুষ, তার উপরে শরীর কত খারাপ, এখন এমন পিত্তি পড়লে মায়েরও ক্ষেতি বাচ্চারও ক্ষেতি। বাচ্চা হবার সময়ে শক্তি পাবে কোথায়?'

ঝিয়ের মুখে এ রকম স্পর্ধাযুক্ত কথা শুনে হেমলতা অগ্নিমূর্তি হয়ে

ওঠেন। রমেশের মার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করে দেন। বলেন, 'বেশী বেশী কথা বললে দেব তাড়িয়ে।'

তবু রমেশের মার কষ্ট হয় দেবযানীর জন্য। হেমলতার চাবি দেয়া ভাঁড়ার থেকে কোন ফাঁকে চিনি চুরি করে আনে, গ্লাস ভর্তি সরবৎ বানিয়ে নিয়ে এসে বলে, 'খেয়ে নাও বউদি। চিনির জল ভালো। শরীর ঠাণ্ডা থাকে, দেহে বল হয়।'

পিতার গৃহে সকলের অপরিমিত আদরে যত্নে মনোযোগে স্নেহে মমতায় আপ্লুত হয়ে থেকে এসে এই ব্যবহার দেবযানীর কাছে আরো অসহ্য লাগে।

ইদানিং সন্দীপনের দিনে রাত্রে বিশ্রাম নেই। আপিসে বছর শেষের কাজ, তার উপরে রাত জেগে ছবি আঁকা—সময়ের খেই ধরতে পারে না। দু'চার মাসের মধ্যেই একজন শিশু আসবে বাড়িতে এই ব্যস্ততা তারও একটা প্রস্তুতি। টাকার দরকার, সুতরাং যে যা কাজ দিচ্ছে নিচ্ছে হাত বাড়িয়ে। বলাই বাহুল্য মনোমতো কাজ নয়, পয়সা রোজগারের কাজ। মা-বাবা তাঁকে দিল্লীতে রাখতে চেয়েছিলেন, রাজী হয়নি, এই কলকাতা শহরে, তার বাড়িতেই তার শিশু ভূমিষ্ঠ হোক এই তার বাসনা। স্ত্রীকে সে বড়ো ডাক্তারের হাতে রাখবে। বিলিতি নার্সিং হোমে ভর্তি করবে। নিজের চোখের আড়াল করবে না। খুব ভয় হচ্ছে স্ত্রীর জন্য, মমতায় ভরে আছে মন। আজকাল সে রীতিমতো খোঁজ খবর করে, 'মনি, তুমি ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করো তো?' কিছু বলতে গিয়েও আবার চুপ করে যান দেবযানী। কিছুতেই বলতে পারেন না, ঐ কষ্টেই আমি মরে যাচ্ছি। তোমাব মা এবার এইভাবেই আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

সন্দীপন আবার বলে, 'ডাক্তার কিন্তু ভালো করে খেতে বলেছেন, দুধ খাবে, ফল খাবে—'

এবার দেবযানী প্রায় নির্লজ্জের মতোই বলেন, 'হ্যাঁ, ঐ ফলটা তুমিই রোজ নিয়ে এসো আপিস থেকে, কেমন ?'

সন্দীপন বলে, 'নিশ্চয়ই, যা তোমার খেতে ইচ্ছে করবে, আমাকে বলে দিও, আমি নিয়ে আসবো।'

একদিন রমেশের মা বললো, 'এক কাজ করো বউদি—'

'কী ?'

'তুমি আমাকে পয়সা দিও, আমি আর একটা উনুন কিনে আনবো।'

'কী করতে ?'

'সেটা আমরা ধরাবো, মা ওটা নেবেন। আর কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক বলেছ।'

'স্টোভটাও ব্যবহার করা যায়। মা উনুন নিলে ওটাতেই তো আমাদেরটা আমরা করে নিতে পারি।'

'পারবে ?'

'কেন পারবো না ?'

'অনেক তেল খরচ হবে যে, কেরোসিন ফুরোলে মা আস্ত রাখবেন না।'

'তা এখন কী হবে, খিদে মরে যাওয়া এ অবস্থায় খুব খারাপ।'

'আমি মরে গেলেই ভালো হয়।'

'ছি ছি ছি—' এতোখানি জিব কাটে রমেশের মা, 'কতো ভাগ্যিমানী তুমি। দাদাবাবুর মতো অমন দেবতুল্য স্বামী ক'জন মেয়ের ভাগ্যে জোটে ? মা যে এ রকম করেন তুমি বলো না কেন দাদাবাবুর কাছে ? না বললে জানবেন কী করে ?'

দেবযানী হাসেন, 'কী বলবো ? মা আমাকে খেতে দিচ্ছেন না ?'

'ঘটনাটা বলবে।'

'বলা যায় নাকি ?'

সত্যিই বলা যায় না। নালিশটি হবে একটা স্ফুলিঙ্গ, তক্ষুনি অগ্নিকাণ্ড

শুরু হয়ে যাবে বাড়িতে।

এর থেকে স্টোভে নিজেদেরটা নিজেরা করে নিলেই ল্যাঠা চোকে। সেই বন্দোবস্তই করলেন। ডাল ভাত তরকারী, চমৎকার রান্না হয়ে যায় সেই বিলিতি প্রাইমাস স্টোভে। কিছু টের পান না হেমলতা, অশান্তিও নেই কোনো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। যেদিন জানলেন, তুমুল কাণ্ড করলেন। আক্রোশের আতিশয্যে শূন্য তেলের বোতলটাও যেমন ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে টুকরো টুকরো করলেন, স্টোভে ভরে ফেলা তেলগুলোও উপুড় করে ঢেলে দিলেন নর্দমায়।

এই প্রথম দেবযানী, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা প্রতিবাদ করলেন, তেলগুলো ফেলে দিলেন কেন? বিকেলের খাবার তৈরী করতে হবে না? রেগে যাবে না ঠিকমতো চা না পেলে? কতো ক্লান্ত হয়ে আসবে—'

এ কথার জবাব দিলেন না হেমলতা। বলতে লাগলেন, 'কেন এতো খরচ হয় বাছাধন বুঝুক এবার। উনুনে একগাদা কয়লা পুড়িয়েও মন ওঠে না, আবার কেরোসিনের শ্রাদ্ধ করে স্টোভ। হুঁ। এর নামই লোভ। ভাবে তো বুঝি, সবই আমি খাই। ঐ যে রাত্রে ছুটো সন্দেশ আনি ঐটাই প্রাণে সয়'না। অমনি গিয়ে কানে লাগানো। দিস তো মোটে আধসের দুধ আর একপো চাল। মাছও খাই না যে বলবি এতো দাম ততো দাম। ঐ তো তরকারীর ঘঁ্যাট আর ডাল। ফলের মধ্যে তো ছ'টা মর্তমান কলা আর ওদিকে অশ্বমেধ যজ্ঞ লেগে গেছে। এই ওষুধ, এই ডাক্তার, এই অমুক এই তমুক, আর কারো পেটে যেন কোনোদিন বাচ্চা আসে না, এই নতুন।'

যতোক্ষণ না খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যান ঐ একই বিষয়ে তাঁর গজর গজর চলতে থাকে। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে প্রায় রোজই ভাইঝির বাড়িতে গিয়ে একটু শুয়ে নেন। তারপরে দল বেঁধে কোথায় পাঠ হচ্ছে কীর্তন হচ্ছে এ সব জায়গায় গিয়ে ধর্ম করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ঐ সময়েই নিজের রাত্তিরের খাবারটা নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। কোনোদিন ভীমনাগের সন্দেশ, আর দ্বারিকের লুচি ছোলার ডাল। কোনোদিন দই খই কলা, কোনো কোনো দিন রাবড়িও আনেন।

•

বিকেলে সন্দীপনের জলখাবারটা আজকাল দেবযানীই করেন। ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে, এসেই চায়ের তেষ্টা। বিকেলের এই চায়ের আসরটা বড়ো ভালো লাগে দেবযানীর। পাশাপাশি তিনখানা ঘরের সঙ্গে ভিতর দিকে টানা লম্বা ঢাকা বারান্দায় পশ্চিমের সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে চা এবং গল্প দুই-ই জমে ওঠে। তখন আর দেবযানীর মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না, দুঃখ থাকে না, অভিযোগ থাকে না।

কিন্তু সেই বিকেলে সেই সুখটুকুও ছিঁড়ে গেল। দুপুরের দিকে হঠাৎ ধুম করে জ্বর এলো রমেশের মার। স্টোভে তেল ভরা হলো না, রাগের বশে ধাক্কা দিয়ে উনুনও ভেঙে দিয়েছিলেন হেমলতা, সেই উনুন জোড়ানো হলো না, আপিস থেকে ফিরে এসে তৈরী চা না পেয়ে সন্দীপনের মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল।

দেবযানী বিপন্নভাবে বললেন, 'কী করবো, রমেশের মার জ্বর এসে গেল, কে যাবে মুদি দোকানে ? আমি তো যেতে পারি না ? তুমি যদি গিয়ে একটু তেলটা এনে দাও—'

তখনকার দিনে মেয়েদের যখন তখন দোকানে বাজারে বেরিয়ে জিনিসপত্র কিনে আনার চলন ছিলো না। মুদিদোকান তো কক্ষনো না। মুদিদোকান, পানের দোকান, দৈনন্দিন বাজার এ রকম আরো কয়েকটা জায়গা ছিলো যেখানে সম্ভ্রান্ত মেয়ে বউরা যাবে সেটা ভাবনার অতীত। অতি আধুনিকারা অবশ্য স্বামীর সঙ্গে মনোহারী দোকানে যায়, নিউমার্কেটে যায়—দেবযানী সন্দীপনের সঙ্গে এ সব জায়গায় অনেকদিন গিয়েছেন।

রেগে গিয়ে সন্দীপন বললো, 'কেন, মুদিদোকানে যেতে তোমার

বাধাটা কোথায়? তুমি কি অসূর্যম্পশ্যা? না কি কোনোদিন কোনো পুরুষের মুখ দেখোনি? রমেশের মার জ্বর, তোমারি যাওয়া উচিত ছিলো।'

রাগ করে দেবযানী বললেন, 'না হয় মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে গেলামই, কিন্তু তোমার মুদি কি আমাকে চেনে যে গেলেই বাকী দেবে?'

'না দেয় নগদে আনবে?'

'পয়সা?'

'মার কাছে চেয়ে নিতে পারোনি?'

'না। তোমার মার কাছে পয়সা চাইতে আমার খারাপ লাগে।'

'অপমান?'

'হ্যাঁ। আমার নিজের বলে যে একটা পয়সাও কখনো থাকে না সেটাও আমার অপমান। তুমি দেখবে সেই অপমানের ভয়ে দিল্লি থেকে আমি কতো খাম পোস্টকার্ড কিনে এনেছি? ঐ চাইবার লজ্জাতেই কিনে এনেছি। অনেক আগে এই ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার একবার ঝগড়া হয়েছিলো মনে আছে?'

'এতো অপমান বোধ থাকলে সংসার চলে না।'

কথা না বাড়িয়ে দেবযানী বললেন, 'বোতল দিচ্ছি, দয়া করে তেলটা আমাকে এনে দাও। এই তো একপা মুদির দোকান।'

'আমি পারবো না। ঐ সব মুদিদোকান-ফোকানে যেতে আমার বিশ্রি লাগে। আমি কোনোদিন দোকান বাজারে যাই না তা তুমি জানো।'

'যাওনা যাবে। পুরুষশাসিত সমাজে কাজের বিভাগ তোমরাই করে দিয়েছ। বাইরের কাজ পুরুষদেরই করার নিয়ম।'

'সে নিয়ম আমি মানি না। মানলে তোমাকেও ঘরে আটকে রেখে দিতাম।'

'তা বটে।'

'আমার মা যেতে পারে আর তুমি যেতে পার না?'

গোলমাল শুনে জ্বর শরীরে কাঁপতে কাঁপতে কখন উঠে এসেছে রমেশের মা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বললো, 'বউদি বোতলটা আমাকে দাও।'

দেবযানী দিলেন না। নিঃশব্দে নিজেই বেরিয়ে গেলেন। সেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ সংসারের সব দায় একা মাথায় নেবার।

মোড় ঘুরেই দোকান, বুড়ো মুদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খরিদ্দারদের নিয়ে। মধ্যে মধ্যে তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো, 'বউদি, আপনি!'

লোকটিকে দেবযানী দেখেছে। মাসের শেষে তাগাদায় যায়। বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এক বোতল কেরোসিন।'

'কালই তো রমেশের মা নিয়ে গেল।'

'স্টোভে ভরে ফেলেছিলাম, পড়ে গেছে।'

'ওমা। রমেশের মাকে পাঠালেন না কেন? তা বলে আপনি?'

অন্যান্য বাড়ির কাজের লোকজন বা পুরুষ ক্রেতার ভিড়ে সে বউদিকে এক মিনিটও দাঁড় করিয়ে রাখলো না, ছোকরাটিকে ফরমাশ না করে, মাপ ফেলে নিজেই উঠে গিয়ে এনে দিল। দেবযানীর বেশভূষা চেহারা চলন কিছুর সঙ্গেই অন্যান্য মেয়ে খরিদ্দারদের কোনো মিল না থাকায় বাবুরা এবং সেইসব মেয়েরা তাকে দেখছিলো তাকিয়ে তাকিয়ে। সামনের এক অন্ধগলিতে কিছু বেশ্যালয় আছে। সেজেগুজে তারা আসে বটে অনেক সময়, এই মেয়ের সঙ্গে তাদেরও কোনো মিল পাচ্ছিলোনা তারা।

সেদিন দেবযানী অপমানিত হয়েছিলেন। স্বামীর সাংসারিক কর্তব্য বিমুখতায় আহত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে সেই মূলধন তাঁকে তিনি যা তার চেয়েও অনেক বড়ো ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। সেদিন যদি তিনি স্বামীর সঙ্গে মুদিদোকানে আসতেন, স্ত্রী হয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, অপমানের দুঃখ তাঁকে জর্জরিত করতো

না বটে সেই সঙ্গে অবিশ্রান্ত একটি পুরুষের অধীনতা এবং নির্ভরতা থেকেও কোনোদিন মুক্তি পেতেন না।

অবশ্য সেই বিকেল থেকে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তিনি কথা বলেননি।

•

কতোকাল আগের কথা সে সব? কতো কাল আগে? সে কি পূর্বজন্মের? পূর্বজন্মের হবে কেন? এই তো সেদিন। এখন মনে হয় এই তো সেদিন তাঁর কুড়ি বছর বয়েস ছিলো, এই তো সেদিন প্রথম সন্তান কোলে এলো, দ্বিতীয়টি হলো, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলো সন্দীপন। কোথায় রে ডাক্তার, কোথায় রে ওষুধ, কোথায় পথ্য। ট্রে-ভর্তি ফল। 'খাও, খাও, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। দেবযানী, তুমি ছাড়া আমার ভুবন অন্ধকার। কেন সব কষ্ট একা তোমার? কেন ভগবান মেয়েদের উপর এমন নির্মম। কেন তুজনের মধ্যে এই যন্ত্রণা ভাগ করে দেননি। সন্তান তো তুজনেরই সৃষ্টি। তবে কেন মাকেই একা সব বহন করতে হবে। হায় হতভাগ্য পুরুষ। কী নিরুপায়।'

স্বামীর কোলের উপর তুর্বল হাত মেলে দিয়ে দেবযানী বললেন, 'কতো কষ্ট গেল তোমার। সব তো একা একা। এ-বাড়িতে এসে কতো আত্মীয় বন্ধুরা থাকে খায় ওঠে, বিপদে কেউ একটু সাহায্য করে না।'

'তবু তো তোমার শিক্ষা হয় না।'

দেবযানী হাসেন। বলেন, 'আমাদের কোনো কাজে না আসুক, যারা এসে ওঠে থাকে খায়, সেটা তাদের পক্ষে তো খুব সুবিধের? ঐ কারো না কারো ভালো হলেই হলো।'

বারো

হেমলতা কাঁদতে কাঁদতে কাশী গেলেন। ঐ সেদিনেরই জের। পুরো এক বিকেল থেকে আর এক বিকেল পর্যন্ত যে স্বামীর সঙ্গে কথা বললেন না সেই সময়ের মধ্যে মনে মনে তিনি একটা বিষয়ে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। নিজের এতোটুকু ব্যতিক্রম সন্দীপন সহ্য করতে পারে না সেটা অজানা নয়, কিন্তু তার এমন প্রকট চেহারা আর কখনো দেখার সুযোগ ঘটেনি। মানুষ তো যন্ত্র নয় যে সব সময়ে সব অঙ্কের মতো নির্ভুল নিয়মে করে যেতে পারবে? আর স্টোভে তেল না থাকাটা যেখানে দৈব, যেখানে বাড়িতে সন্দীপন ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ নেই, যেখানে প্রত্যেক পদক্ষেপে আর্থিকভাবে দেবযানী শাশুড়ির করতলগত, যেখানে সেই শাশুড়ি পুত্রবধূর প্রতি অতো নিষ্ঠুর এবং যা সন্দীপন জানে এবং যেখানে রমেশের মা এমন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সেখানেও যে এক-বিন্দু বিবেচনা কাজ করলো না সন্দীপনেব মনে এতে দেবযানী তাজ্জব বনে গেলেন। ঠিক সময়ে ঠিকটি পেতেই হবে, তাতে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায় তো যাবে এমন ভয়ঙ্কর অভ্যাসের উপর এমন ভয়ঙ্কর দাবী তাঁর এক ধরনের পাগলামীর মতো মনে হলো। মনে হলো এ তো একটা অসুখ। তা নৈলে সে কী করে ঐ পড়ন্ত বিকেলে তার সাত মাস অন্তঃস্বত্তা অসুস্থ স্ত্রীকে বোতল হাতে পাঠিয়ে দিল মুদির দোকানে?

তারপর সব যখন নিয়ম মতো হলো, একটু দেরী হলেও পছন্দ মতো পাওয়া গেল সব তখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা হলো, তখন সবিনয়ে তার মুখ দিয়ে এই জিজ্ঞাসাটি উচ্চারিত হলো, 'একা একা মুদিদোকানে গিয়ে দাঁড়াতে খুব খারাপ লেগেছে তোমার, না?'

দেবযানী জবাব দিলেন না। চায়ের পাট তুলে শয়নকক্ষে এসে শাড়ি পাল্টে, মাথা আঁচড়ে চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এ-ও নতুন। এর আগে সন্দীপনকে সঙ্গী না করে আর কখনো এ রকম বেরোননি। বলা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে বিবাহিত মেয়েদের সেটা প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। যদি কলকাতারই স্কুলে কলেজে পড়ে কলকাতার

ঘরণী হতেন তা হলে হয়তো সব অন্য রকম হতো। পথঘাট চিনতেন, বেরোতে অভ্যস্ত থাকতেন, নিষেধ শাসনের বেড়া ভাঙতে বেগ পেতে হতো না। তিনি অবশ্যই পর্দানসীন নন। সন্দীপন অবশ্যই মেয়েদের চার দেয়ালে বন্ধ হয়ে থাকার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু তিনি তো এখানে আগন্তুক।

একা একা ট্রামে উঠে টিকিট কেটে রসা রোড থেকে এলগিন রোডে কাকার বাড়ি পর্যন্ত যেতেই প্রায় ঘর্মাক্ত। গলি পেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় এসে ঘা দিয়েও বুকের কাঁপুনি কমেনা।

সবাই মহাখুশি, 'আরে মনি। আয় আয় আয়। তারপর? হঠাৎ? সন্দীপন কোথায়?'

অল্প সময়ের মধ্যেই কাকা-কাকিমা ভাই-বোনদের সংস্পর্শ তাঁর সকল দুঃখ অভিমান ভাসিয়ে দিল। যখন চকিত হয়ে ঘড়ি দেখলেন, চমকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'নটা? এর মধ্যে নটা বেজে গেল? কী আশ্চর্য!' তারপরেই আসল আতঙ্ক। এখন যাবেন কী করে এতো রাত্রে। এই প্রথম অভিযানেই ততো সাহস তার হলো না যে আবার একা একা যান। তখন ছিলো সন্ধ্যা, এখন রীতিমতো রাত্রি।

কী যে করবেন, কী যে বলবেন, কাকে যে সঙ্গী হতে অনুরোধ করবেন এবং সেজন্য কী কৈফিয়ৎ দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মনে মনে গোবিন্দকে স্মরণ করছিলেন সংকট ত্রাণের জন্যে। সত্যিই সংকটের সমাধান হলো। দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে সন্দীপন এসে হাজির হয়েছে। অভিমান আবার উথলে উঠেছিলো, দপ করে রাগের আগুনও বেশ জ্বলে উঠেছিলো। কিন্তু সন্দীপনের চিন্তাভারাক্রান্ত করুণ কাতর চোখের দৃষ্টি দেখে থমকালেন। তাছাড়া ছোট্ট একটি বানানো কথার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায়ও খুব সুখী হলেন।

এখানে আসা মাত্র সবাই যখন 'সন্দীপন কোথায়, একা এলি কী

করে ? কী হয়েছে ?' ইত্যাদি প্রশ্নের বন্যা ছুটিয়েছিলেন, তখন তিনি এই জিজ্ঞাসা থেকে সবাইকে নিবৃত্ত করতে বলেছিলেন, 'আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে একটা কাজে গেছে। আবার নিতে আসবে।'

রক্ষে যে সন্দীপন হাটে হাঁড়ি ভাঙলো না। সকলের সানন্দ অভ্যর্থনা সানন্দেই গ্রহণ করে যেন কিছুই হয়নি এভাবে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে গল্প করলো, অরুণার সঙ্গে রসিকতা করলো, তারপর একান্তই সহজ গলায় বললো, 'চলো।'

পথে আসতে আসতে ট্রামে পাশাপাশি বসে হাতের উপর হাত রেখে বললো, 'এ রকম না বলে চলে এসেছ, আমার কতো ভাবনা হয়েছিলো জানো ? আর এই অবস্থায়।'

দেবযানী না বলে পারলেন না, 'আর এই অবস্থায় স্ত্রীকে তেলের বোতল হাতে দিয়ে ঠিকে ঝিয়েদের মতো, অথবা শঙ্করগলির বেশ্যাদের মতো মুদিদোকানে পাঠাতে বুঝি কোনো চিন্তা হয়নি।'

সন্দীপন অপ্রস্তুত ভাবে হাসলো, 'তুমি তো জানো সময় মতো কিছু না হলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

'তা হলে সেই মাথা তোমার মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'রাগ কোরো না।'

না, রাগ করে আর কী করবেন ? যার যেমন চরিত্র। তাই সারা-জীবনই স্বামীর সব ইচ্ছেকে, সুবিধাকে, অভ্যাসকে লালন করেছেন, পালন করেছেন, মান্য করেছেন, ক্ষমা করেছেন। রাগও কি করেন নি ? তা-ও করেছেন। সেটা অল্প বয়সে নয়, বেশী বয়সে। যখন সন্তান-সন্ততি আত্মীয় বন্ধু সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে সংসারে সন্দীপনের ইচ্ছেই ইচ্ছে, সন্দীপনের অভ্যাসই অভ্যাস। দেবযানীর অস্তিত্বের দামটা যেন সেই অঙ্ক দিয়েই কষা। বেশ অপমান বোধ করেছেন তখন, বেশ আহত হয়েছেন।

ছেলেমেয়েদের মুখে লেগেই আছে, 'না না, বাবা ওসব পারেন না।'

বন্ধুবা বলেছে, 'ক্ষেপেছেন ? ওসব সন্দীপনের কাজ নয়।'

কিন্তু তাঁব কাজের বেলায় কোনো পারা না পারাব প্রশ্নই নেই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত দেবযানী কবে দেবেন, সেটাই স্বতঃসিদ্ধ।

প্রথম মেয়ে বুলু যখন ছোটো, একবাব খুব সর্দি জ্বব হলো তাব। সাবধানে রেখে, নিজেব জানা বিদ্যা মধু তুলসীপাতা ইত্যাদি সব টোটকা প্রয়োগ করেও কিছু হলো না। ববং জ্বব উত্তবোত্তর বেড়েই চললো। একরাতে এমন হলো যে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ব্যাকুল হয়ে ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে তুলে বললেন, 'তুমি শীগগীব যাও, একজন ডাক্তাব নিয়ে এসো।'

সন্দীপন লাল লাল চোখে তাকালো. বললো, 'কেন, কী হয়েছে ?'

'বুলু কেমন করছে।'

'কী করছে ?' উঠে বসে মেয়েব দিকে তাকিয়ে আবাব শুয়ে পড়ে বললো, 'জ্বব দেখেছো ?'

'দেখেছি।'

'কতো ?'

'দুইয়েব উপরে।'

'তাই নাকি ?'

'দেখছো না নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, কেমন ঝিমিয়ে রয়েছে। আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? পাড়ায় তো খুব হাম হচ্ছে, ওরও বোধহয় তাই হবে।'

'হাম ? তবে তো ভালোই। হাম এই বাচ্চা বয়সে হয়ে যাওয়াই ভালো।'

'না, তুমি একজন ডাক্তার নিয়ে এসো।'

'ডাক্তার ? ডাক্তার এখন কোথায় পাবো ?'

'কী আশ্চর্য! তা-ও কি আমি বলে দেব ? তোমার মেয়ে, তার অসুখ করেছে, যেখান থেকে পার সেখান থেকে নিয়ে আসবে ডাক্তার।'

সন্দীপন যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বললো, 'এটা একমুঠো নয়াদিল্লী নয় যে ডাক্তার মোক্তার সবাই সকলকে চেনে, যখন খুশি তখন ডাকলেই হলো। এটা কলকাতার মহাসমুদ্র, রাত বারোটায় এখানে কোনো ডাক্তার আসবে না।'

'আসবে। তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও, ডক্টর চক্রবর্তীকেই ডেকে আনো না, এই তো কাছে, উনি ঠিক আসবেন।'

'আমি পারবো না। চেনা নেই জানা নেই রাত বারোটায় গিয়ে ঘুম ভাঙানো। প্রতিবেশী হলেই হলো, না?'

এরপরে দেবযানীর চোখে জল এলো। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন চুপচাপ। ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠলো সন্দীপন। ব্রাকেট থেকে লটকে রাখা পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। ডাক্তার নিয়ে ফিরলো। ডাকা মাত্রই উঠে এসেছেন ডক্টর চক্রবর্তী, মুখে একটুও বিরক্তির রেখা নেই। এসেই আদর করলেন বুলুকে। বললেন, 'বুলুমনির কখন জ্বর হলো? কাল বিকেলেও তো রমেশের মার সঙ্গে আমার চেম্বারে গিয়ে খেলা করেছে।'

দেবযানী বললেন, 'আপনার চেম্বারে? যায় বুঝি?'

'রোজ যায়। ও না গেলে তো আমার দিনই খারাপ কাটে। ভালোই হলো আপনাদের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল।' ওষুধ লিখে দিলেন তিনি। বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন, আমিই আমার চেম্বার থেকে ওষুধটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

আবার বেরুতে হলো সন্দীপনকে, ওষুধ আনতে হলো। দেবযানী বললেন, 'ছাখো তো কতো সহজে ডাক্তার পেলে, ওষুধ পেলে। একটু না হয় ঘুমের ব্যাঘাতই হলো। তোমারই তো মেয়ে। চিন্তা তো একা আমার নয়?'

'হুঁ।' সন্দীপন এই একটি শব্দবাণ নিক্ষিপ্ত করেই আবার শুয়ে পড়লো। ঘুমুতেও দেরি হলো না। কিন্তু স্ত্রীর রাত করে এই অন্যায় আব্দারের শোধ সে নিল তিনদিন মুখ অন্ধকার করে থেকে।

এই ব্যবহার খুব খারাপ লেগেছিলো দেবযানীর। সন্দীপন রেগে থাকলে থাকতে পারেন না তিনি। সন্দীপনের অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি আঁকা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সবই বাড়িটাকে প্রাণে ভরপুর করে রাখে। সেই সন্দীপন মুখ ভার করে থাকলে কি চলে। সাধ্য সাধনা করে আবার মেজাজ ভালো করে দিয়েছেন, বাড়ি আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে।

সন্দীপন সন্দীপনই। তার রাগ, জেদ, বিরক্তি, ইচ্ছে অনিচ্ছে, অসহিষ্ণুতা, ছেলেমানুষি, স্বার্থপরতা সমস্ত কিছুই ক্ষমার যোগ্য। দেবযানী জানেন এই সব বৃত্তিগুলোর মধ্যে মানুষটার কোথাও একবিন্দু মালিন্য নেই। গ্লানি নেই। ঠিক মতো পেলেই বোদ উঠলো আকাশে, খুব খুশি। এমন অম্লান খুশি বয়স্কদের মধ্যে শুধু সন্দীপনই হতে পারে। হয়তো সেই জন্যই স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা প্রেম সব কিছুর মধ্যে মাতার মতো স্নেহ মমতা এবং রক্ষণশীলতাও কাজ করেছে দেবযানীর মনে। যার কোনো ক্ষয় সম্ভব ছিলো না। শুধু হেমলতা যদি একটু বুঝের হতেন। একবিন্দু ভদ্রতাও বিতরণ করতেন তাঁকে।

সেদিনের সেই বিকেলের ঘটনা যে শেষ পর্যন্ত মহিলাকে কাশী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে এটা কিন্তু তিনি কল্পনায়ও আনেননি। তিনি মনে মনে যা ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে সত্যিই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে একটা বন্দোবস্ত করা। যাতে প্রাত্যহিক কলহ বা অশান্তি থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যেই কাকার বাড়ি গিয়েছিলেন। কাকিমাকে বলেছিলেন, 'কাকিমা তুমি আমাকে কয়েকটা টাকা দিতে পারো?'

কারো কাছে কিছু চাওয়া বিষয়ে বরাবরই দেবযানী ভীষণ লাজুক। টাকার অঙ্কে টাকা চাওয়া তো দূরের কথা, আব্দার করে যে মা বাবা দাদু ঠাকুমা বা এই একমাত্র কাকার কাছে কিছু নেবেন তা-ও কোনোদিন পারেননি। অথচ সকলেই দিতে উৎসুক, দিতে পারেনও। অরুণা চায়, বলে, 'বাবা এবার কিন্তু আমাকে অমুক শাড়িটা কিনে দিতে হবে।'

অথবা দেবযানীর মাকে লেখে, 'বড়োমা, তুমি কিন্তু পূজোতে এবার আমাকে একটা জামিয়ার কিনে দেবে। জেঠু শাড়ি কিনবে আর তুমি জামিয়ার।'

ভাইঝির এই আব্দার তার বড়োমা এবং জেঠু দুজনেই মহা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। একটু একটু কৃত্রিম, ঝগড়াও হয় তাই নিয়ে। ওঁরা লেখেন, 'অত নয়। আবার বিয়ে দিতে হবে না? তখন বুঝি আর একটা নতুন জামিয়াব কিনবো?'

অরুণা দেবযানীকেও বলে, 'এই দিদি, তুই কিন্তু পূজোতে দামী শাড়ি দিবি। সন্দীপনদাকে বলবি কিপ্টেমি করলে মার খাবে।'

কী মিষ্টি। বোনকে তখন সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন দেবযানী। কিন্তু নিজে এই ধরনের আব্দার করতে পারেন না। অদ্ভুত কুণ্ঠা। আবার জিজ্ঞেস করলেও লজ্জা, 'না না, আমার দরকার নেই।' অথবা, 'আমার তো আছে, আবার কেন?' অথবা, 'অত দাম দিয়ে কিনোনা।'

সেই দেবযানী যখন কাকিমার কাছে কয়েকটা টাকা মুখফুটে চাইতে পারলেন তখন তিনি নিজেও নিজের কানে নিজেব প্রার্থনা শুনে অধোবদন হলেন, কাকিমাও বুঝলেন ব্যাপারটা অত্যন্তই জরুরী। তা নৈলে এই মেয়ে এভাবে বলতে আসেনি। খোলা হাতেই দিলেন তিনি, সেই সঙ্গে এও বললেন, 'এ টাকা তোকে ফেরৎ দিতে হবে না। আর প্রত্যেক মাসে আমি তোকে একটা হাত খরচ দেবো। সেটা তো আমাদের অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিলো। দাদা দিদি এখানে থাকলে কতো কিছু করতেন। এই অবস্থা, আমি তো কিছুই করতে পারি না। কিন্তু তুই এ রকম হুটহাট ট্রামে বাসে উঠিস না। এই সময়টাতেই খুব সাবধানে থাকতে হয়।'

সেই টাকা নিয়ে ফিরে এসে দেবযানী চিঠি লেখার প্যাডে একটা লিস্ট করতে বসলেন। প্রথমেই দশ সের কয়লা আর একটা উনুন। সন্দীপন বসে পোট্রেইট আঁকছে এক মহিলার। পাশে তার ছোটো একটি প্রতিকৃতি। এটা দেখেই আঁকতে হচ্ছে। মহিলা মৃত, আঁকাচ্ছেন

তাঁর স্বামী। লম্বা টাকা কবুল করেছেন। নেহাৎ টাকার এখন ভীষণ দরকার তাই, নইলে পোট্রেইট আঁকতে তার ভালো লাগে না। অঙ্ক কষা কাজ। তা-ও যদি সজীব মানুষটি কাছে বসে, তাকে আঁকতে মন্দ লাগে না। চরিত্রটা ধরা যায়। যাকে কখনো দেখেইনি তার ফটোর আকৃতির সঙ্গে আকৃতি মেলানো ভারি একঘেয়ে লাগে। পোট্রেইট আঁকার কাজটা সাধারণত দেবযানীই নেয়। ওটা তার আসেও খুব সহজে। কী তাড়াতাড়ি সে সাদৃশ্য তুলে ফেলে। সন্দীপন মাঝে মাঝে স্ত্রীর সহজ শক্তি দেখে এতো অবাক হয়ে যায় যে, আদরের আতিশয্যে কাজ পণ্ড।

দেবযানীকে চিন্তিতভাবে কিছু লিখতে দেখে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'কবিতা লিখছো নাকি?' ভাব হয়ে গেছে ততোক্ষণে। দেবযানী হাসলেন, 'হ্যাঁ। শুনবে নাকি।'

'পড়ে ফ্যালো। পড়ে ফ্যালো।'

দেবযানী পড়লেন, 'দশ সের কয়লা আর একটা উনুন, তারপর আর কী শাগ্‌গির বলুন।'

'ওরে সব্বোনাশ এ যে সাংঘাতিক আধুনিক কবিতা। একেবারে কাঠকয়লা কেরোসিন। কী ব্যাপার?'

'সে সব জেনে আর কাজ নেই তোমার।'

সন্দীপনকে সত্যিই এ সব ব্যাপার থেকে দূরেই রাখতে চেয়েছিলেন দেবযানী। সংসারের নিত্যকার এই ক্লেদাক্ত চেহারা দেখিয়ে অনর্থক মানুষটাকে আর বিব্রত করা কেন? আগুন তাতে ইন্ধন পাবে ছাড়া আর তো কিছু হবে না?'

তবু হলো। পরের দিন সন্দীপন আপিসে চলে গেলে যথারীতি উনুন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন হেমলতা। রমেশের মা-ও বাজারের সময়ে নতুন কিনে আনা উনুনটি ধরিয়ে নিজেদের রান্না চাপালো। পুজোআর্চা সেরে একবার বাথরুমের দিকে যেতে গিয়েই গনগনে উনুনে রমেশের মাকে কড়াইতে পালংশাক ছাড়তে দেখে হেমলতা থমকে দাঁড়ালেন, 'এ কি।'

রমেশের মা-ও থমকে গেল। ভয়ে আর কথা বলতে পারছিলো না।

'কার রান্না হচ্ছে?'

রমেশের মা চুপ।

'এ উনুন কোথায় পেলে?'

রমেশের মা চুপ।

'বউমা।'

সমস্ত শক্তি সংহত করে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দেবযানী, নতমস্তকে দাঁড়ালেন, হেমলতা খাদের গলায় গর্জে বললেন, 'এখানে কার রান্না হচ্ছে?' দেবযানী ঢোঁক গিলে বললেন, 'আমার আর রমেশের মার।'

'কী।'

'একটা উনুন নিয়ে টানাটানি হয়, তাই ভাবলাম—'

'ও। তা উনুনটা কে কিনে আনলো?'

'রমেশের মা।'

'দুটো উনুন জ্বললে কতো কয়লা লাগে তা কি জানো?'

'আমি কিছুটা কয়লাও এনেছি।'

'ও।' এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে উনুনের আগুনের চেয়েও গরম চোখে তাকিয়ে চলে গেলেন হেমলতা।

তাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

রমেশের মা গলা খাটো করে বললো, 'আমার খুব ভয় করছিলো বউদি।'

দেবযানী বললেন, 'খুব রাগ করলেন উনি এ ব্যবস্থায়। কিন্তু কী করবো বলো?'

'সেই তো।'

'তবু যে কোনো চ্যাঁচামেচি করলেন না সেটাই অনেক ভাগ্য।'

'তাই তো।'

কিন্তু দেবযানী জানতেন না আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত কোনদিকে

প্রবাহিত হবে। খেয়ে দেয়ে হেমলতা যেমন বেরিয়ে যান তেমনি বেকালেন যেমন ফিরে আসেন তেমনি এলেন। আসল ঘটনাটা ঘটলো পরের দিন সকালে। সন্দীপন দাড়ি কামাচ্ছিলো দেবযানার ড্রেসিং টেবিলে বসে, দেবযানী বিছানা ঢাকছিলো বেডকভার দিয়ে। রমেশের মা এসে দরজায় দাঁড়ালো, 'বৌদি শোনো।'

দেবযানী কাজ করতে করতেই বললেন, 'কী?'

'মা তো বাজারের পয়সা দিচ্ছেন না। বলেছেন, যার হাতে পয়সা সে দিক, আমি দেবো না।'

'সে কী, এখনো বাজারে পাঠাননি? কী করে রান্নাবান্না হবে? আমি তো আরো নিশ্চিন্তে—চলো তো দেখি।'

দেখাদেখির কিছু ছিলো না! আহত জন্তুর মতো হেমলতাই ছিটকে ঘরের দরজায় এসে ছেলের মুখের কাছে দাঁড়ালেন, গলার স্বর সপ্তমে তুলে হাত নেড়ে বললেন, 'আমি কি তোর বউয়ের দাসীবাঁদী যে যখন তখন যেভাবে খুশি তাকে দিয়ে অপমান করবি আমাকে? আমি ঐ হাবামজাদীর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি?'

চমকে দাড়ি কামানো স্থগিত রেখে মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রায় শিহরিত হয়ে সন্দীপন বললো, 'কী বলছো আবোল তাবোল?'

'আমার বাপের জন্মে আমি এমন শয়তান মেয়ে দেখিনি। ভালো-মানুষ সেজে তো দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা কর না কী বলছি। তুই কি একটা মানুষ? একটা পুরুষ?' সন্দীপন দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকালো। দেবযানীর উদ্দেশ্যে আবার একটা অশালীন গালাগালি উচ্চারণ করে হেমলতা খুনের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করলেন, 'তোর এতোবড়ো সাহস কী করে হয় যে আমার সংসার থেকে আমাকে ভিন্ন করে দিস। দিনে রাত্রে কানের মধ্যে বিষ ঢেলে আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখিস।'

উঠে দাঁড়ালো সন্দীপন, 'মা, আর একবারো তুমি এভাবে কথা বলবে না।'

তার বড়ো বড়ো চোখের সাদা অংশটা লাল হয়ে উঠলো। হেমলতা বললেন, 'নিশ্চয়ই বলবো। একশোবার বলবো। শয়তানকে শয়তান বলবো তাব আবার লজ্জা কিসের ? লজ্জা তোর। যে কুসন্তান মাকে মিথ্যা কথা বলে। বউয়েব হাতে মোটা টাকা গুঁজে দিয়ে আমাকে সংসাব চালাতে বলিস। এতো বড়ো মিথ্যাবাদী তুই ? ওরে কালসাপ, জন্মানো মাত্র কেন তোকে আমি গলা টিপে মেবে ফেলিনি ?'

'মা চুপ করো।'

'আমি কেন চুপ কববো রে হাবামজাদা, তুই চুপ কর, তোর চৌদ্দগুষ্ঠি চুপ করুক। বুকের পাটা থাকে তো ঐ ছিনাল মাগীকে জিজ্ঞেস কর—'

'ছি ছি ছি'—কানে আঙুল দিল সন্দীপন।

আর তারপব সেই সকালে কী যে দক্ষযজ্ঞ হলো, কী যে অভদ্র অসভ্য নোংরা ভাষার তুবড়ি ছুটলো তা বলা যায় না। সন্দীপন না খেয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, হেমলতা লাথি মেরে নতুন উনুন ভেঙে দিলেন, দেবযানীর পেটের মধ্যে সাত মাস পূর্ণ আট মাসের সন্তান অবিরাম ঢেউয়ের মতো নড়াচড়া করতে লাগলো।

এর সাতদিন বাদেই কাশী গেলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা মাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে সন্দীপন সমস্তটা রাত বালকের মতো কাঁদলো। এবং এই প্রথম স্বামীর এতো দুঃখেও দেবযানীর হৃদয় একবিন্দু বিচলিত হলো না। এই সাতদিন তাঁর মাথার উপর দিয়ে যে ঝড় গেছে তা ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। হেমলতার পরিজনেরা দফায় দফায় এসে তাঁকে যে ধরনের কথা শুনিয়ে গেছে, যে সব বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে, শাশুড়ি নিজে অবিশ্রান্ত যতো শাপ-শাপান্ত করেছেন, তার ভার এতো কম নয় যে এখনই বুকের উপর থেকে সেই জগদ্দল পাথর সরে যেতে পারে। বরং মনে হচ্ছিলো, মায়ের জন্য এতো যখন বেদনা, তখন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তার মায়ের সঙ্গেই ঘর করা উচিত। মা তো মা নয়, এক

ধরনের স্ত্রী-ই তো। তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন সন্দীপন মায়ের ভালোবাসার এই বিকৃত চেহারা কি আর দেখতে পায় না? সহ্য করে কী করে?

কী এমন অন্যায় করেছিলেন সেদিন দেবযানী? একটা উনুন নিয়ে টানাটানি। না হয় আর একটা কিনেই এনেছিলেন। ভালোই তো করেছিলেন। ছুটো উনুন থাকাই তো ভালো। উনি নিরিমিষ খান, সব সময়ে খুঁত খুঁত করেন মাছ রান্না হয় বলে। গোবর ল্যাপাতে ল্যাপাতে হয়রাণ করে দেন রমেশের মাকে। আলাদা উনুন দেখে তবে কেন এমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। অবশ্য ক্ষিপ্ত হবাব বড়ো কারণ হিসেবে যা বলে উনি বাড়ি মাথায় করলেন সেটা এই যে দেবযানী টাকা পেলেন কোথায়? তিনি তো ছেলের কাছ থেকে সব টাকা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝে নেন, তা হলে এই টাকা এলো কোথা থেকে। তার মানেই ছেলে মাকে মিথ্যা কথা বলে। লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দেয় বউকে। সেটাই অসহ্য। কী আশ্চর্য। তবুও, তারপরেও যখন হেমলতা কাশীবাসী হবেন স্থিব করলেন তখন কেমন এক অদ্ভুত কষ্ট হলো। যে ছেলেকে একদিন চোখের আড়াল করতে পারেন না, যাকে অভাবে অভিযোগে একাকিত্বে কতো রকম ছুর্যোগের মধ্য দিয়ে আঁচলের আড়ালে রেখে রেখে যত্নে বড়ো করে তুলেছেন, তাকে এভাবে ছেড়ে যাওয়া কি সহজ কথা? বিশেষত তাঁর জন্যই তো এটা হতে যাচ্ছে।

রাগ ছুঃখ অভিমান অপমান সব বিসর্জন দিয়ে শাশুড়ির ঘরে গিয়েছিলেন তিনি। পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিলেন, যেন না যান।

উনি জবাব দেননি, শুধু পা দিয়েই ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে স্বামীর এই কান্না মনের মধ্যে তার ক্রোধ ছাড়া আর কোনো বৃত্তিকেই সজাগ করলো না। কাশী যাবার আগে হেমলতার দিকের আত্মীয়স্বজনরা এসে এসে যখন হেমলতার ঘরে বসে সন্দীপনের নিন্দা আর তাঁর প্রতি কটূক্তিতে হেমলতার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতেন, সেই সময়ে দলছুট হয়ে একজন বিবাহিত মহিলা দেবযানীর ঘরে এসে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কীগো, ঐ ঘরে এতো বড়ো একটা কনফারেন্স

চলেছে, তুমি অনুপস্থিত কেন ?'

ম্লান হেসে দেবযানী বলেছিলেন, 'ফাঁসির হুকুমের অপেক্ষা করছি।'

এই মহিলার সঙ্গে আরো দু-চারবার তাঁর দেখা হয়েছে, ফুর্তিবাজ রসিক এবং বন্ধুতাসম্পন্ন। সম্পর্কে হেমলতারই পিতৃকুলের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

বললো, 'সেই হুকুমের স্বপক্ষে যারা রায় দিতে এসেছেন, কর্তাকে একবার বলো না, জিজ্ঞেস করুক, তাদের একজনও এক সপ্তাহের জন্যও কেউ এই বান্ধবীকে নিজের বাড়িতে রাখতে রাজী কিনা। আপন ভাইও তো একজন আছে এই শহরে, আপন ভাইঝিও আছে। নিয়ে যাক না এতো যখন দরদ। সবচেয়ে মজার মানুষ মেজ জেঠিমা। এক সময়ে কী নির্যাতনই না ভোগ করেছেন এই ননদের হাতে। আর এখন দ্যাখো গিয়ে বসে বসে কেমন চুকলি কাটছেন। বিশ্রী। বিশ্রী। সন্দীপনটা তুই ধমকে ঢিট করে দেয় না কেন ?'

এইসব আসর অবশ্য সন্দীপনের অনুপস্থিতিই বসে। সে আপিসে গেলেই জমে, ফেরার সময় হলেই ভাঙে। নইলে কানে গেলে বা বুঝতে পারলে বরদাস্ত করতো বলে মনে হয় না দেবযানীর। কিন্তু মা বিষয়ে বড়ো দুর্বল।

এখন সেসব কথা মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে। সেই রাত্রে মায়ের বিচ্ছেদ কাতর সন্দীপনকে তার সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিলো। স্ত্রীর কাছে নিশ্চয়ই সে সেটুকু আশা করতে পারে। যতো অন্যায়ই করে থাকুন, মা-ই তো। এটা কেন দেবযানী বোঝেননি। মানুষের হৃদয়ে কতো ময়লাই না থাকে। কিন্তু সেই পাপ আর এখন কী করে মোচন করবেন ?

তের

দিল্লীতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলো সন্দীপন। টেলিগ্রাম পেয়ে দেবযানীর মা এসে পড়েছিলেন। আসবার কথাই ছিলো, তবে এতো আগে নয়। এ অবস্থায় স্ত্রীকে একা বাড়িতে রাখতে তার ভরসা ছিলো না। হায় সন্দীপন, তুমি কোনোদিনই জানলে না যাকে তুমি রক্ষক ভাবতে সে-ই ছিলো তোমার স্ত্রীর প্রধান ভক্ষক। এ রকম একটা অকারণ কলহের পরিণাম যদি এই না হতো তাহলে সত্যি সত্যি বোধহয় দেবযানীর পক্ষে সেই প্রাত্যহিক অভুক্ত অবস্থা ক্রমেই তাঁকে নিস্তেজ করে তাঁর আসন্ন মাতৃত্বকে নিঃশেষ করে দিত।

মায়ের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত মন খারাপ করেছিলো সন্দীপন। বলতো, 'মাকে আমি পিজরাপোলে পাঠিয়ে দিলাম।' বলতে বলতে তার গলা ভেঙে যেতো। নিজের প্রথম সন্তানকে সে সেই কারণেই যথাযোগ্য আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলো না।

এদিকে দিল্লী থেকে তাঁর মা আসার পরে দেবযানীর মন অনেক ভালো হয়ে গেল। সারাক্ষণ ত্রস্তচকিত হয়ে থাকার অবস্থা কেটে যাওয়ায় একটা স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এলো বাড়িতে। মায়ের যত্নে শরীরের ক্ষয়ও পুরে এলো। আস্তে আস্তে সন্দীপনের মন থেকেও কেটে গেল মেঘ। নিজের মাকে যথেষ্ট টাকা পাঠিয়ে যথেষ্ট চিঠি লিখে এই দূরত্বের ব্যবধান ও বেদনা সে অনেকটাই কমিয়ে আনলো। শুধু তাই নয় স্ত্রীকে মাকে নিয়ে নিত্যকার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েও বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

আসলে মানুষের প্রায় সবটাই ধারণা। ধারণাটাই যতো কষ্টের মূল। মাতৃ বিচ্ছেদে সন্দীপন যে অত কাতর হয়ে পড়েছিলো, সেটা সেই ধারণা থেকেই। তার কেবলি মনে হচ্ছিলো বৃদ্ধ গরুকে যেমন প্রয়োজনহীন বলে 'পিজরাপোলে' পাঠিয়ে দেয়, তার অত ভালোবাসার মা-ও তেমনিই কাশীতে নির্বাসিত হলেন। সেইজন্যই সে থেকে থেকে

বারে বারে ঐ শব্দটাই উচ্চারণ করছিলো, মাকে আমি 'পিজরাপোলে' পাঠিয়ে দিলাম।

এতোকাল বাদে সেই স্মৃতিও দেবযানীকে কষ্ট দিল। তখন সন্দীপনের দুঃখে যে তিনি সহায় হতে পারেননি সে কথা মনে করে পুনরায় রাগ হলো নিজের উপব, ব্যক্তিত্বকে পরাজিত মনে হলো। এটাও কিন্তু সেই ধারণারই কষ্ট।

মন আরো পিছনে চলে গেল। হিন্দু বিবাহের নিয়ম নিষ্ঠার অন্ত নেই। বিবাহেব দিন সকাল থেকে সোহাগজল মাপানো হচ্ছে তাঁকে দিয়ে। স্বামীর সোহাগ, আর স্বামীর বাড়িব সকলের সোহাগ প্রার্থনা করানো হচ্ছে ঐ অখণ্ড জলরাশিব মাধ্যমে। তিনি কাঁদছিলেন আর মনে মনে বিদ্রোহ করছিলেন। অবোধ শিশুদের ধারণা নেই তাই তাদের কষ্ট কম। বোধই সকল কষ্টের আধার। সেই বোধ থেকেই এই কষ্টও তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিলো যে এতোদিন ধরে যারা লালন করেছেন, পালন করেছেন, নিজেদের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিকিয়ে দিয়ে তাঁর সুখ-সাচ্ছন্দ্যের দিকেই তাকিয়ে থেকেছেন—যাঁরা রোগে শোকে দুঃখে দারিদ্র্যে প্রতিনিয়ত সহায় হয়ে সান্ত্বনা হয়ে দিবানিশি মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে সেবা এবং শুশ্রূষা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের সমস্ত অধিকার অভিভাবকত্ব ভোজবাজির মতো ন্যস্ত হয়ে যাবে অন্য এক অচেনা অজানা মানুষের হাতে। অধিকারচ্যুত হয়ে তখন তাঁরা প্রার্থী। পিতামাতার প্রতি এই অকৃতজ্ঞতা কি সহ্য করা যায়? অথচ মেয়েদের জীবনে এই অমোঘ নিয়ম।

বিয়ের দশ দিন আগে থেকেই এই ধারণা তাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছে। মা বাবা কাকা কাকী কারো মুখোমুখি চোখাচোখি হলেই উথলে উঠেছে সেই সমুদ্র। কী কান্নাই কেঁদেছিলেন। তাতো তাদের ছেড়ে অন্যত্র যাবার দুঃখে নয়, সেই দুঃখের শিকড় আরো অনেক গভীরে। ঐ ধারণা।

আর যখন বুলুটার বিয়ে হলো! উঃ, ভাবলে এখনো বুকের শিরা ছিঁড়ে যায়। মেয়েদের জীবনে এই দুটো দুঃখই বড়ো কঠিন। একবার কন্যা হয়ে বিদায় নেয়া, আর একবার মাতা হয়ে বিদায় দেয়া। শেষের কষ্টটা পিতামাতা উভয়েরই সমান। এই একটা জায়গাতেই পুরুষ এবং নারী সমতটে দণ্ডায়মান। ধারণ করার কষ্ট নেই, জন্ম দেবার কষ্ট নেই, কিন্তু বিদায় দেবার কষ্ট সমান বেদনাদায়ক। সন্দীপন যে সন্দীপন ছবি আঁকা ছাড়া আর সব কিছুই যাঁব কাছে ধোঁয়াটে, সে-ও মেয়ের বিরহে এতো কাতর হয়েছিলো যে কতোদিন খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ বুলুব শূন্য চেয়ারটিব দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেছে, খেতে পারেনি। কতোদিন ছবিও আঁকেনি, কেবল ঘন ঘন গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে বারান্দায়, আকাশ দেখেছে, গাছ দেখেছে, বড়ো রাস্তার জনস্রোত দেখেছে ঝাপসা চোখে।

বিদায়ের দিনে ভাইবোনদের কান্না তো রোদনে পর্যবসিত হয়ে গেল। তা-ও ঐ বোধ। ঐ ধারণা। দিদি পর হয়ে গেলো। নইলে তাদের দিদি তো দেশান্তরী হয়নি, এক সহরেরই একপাড়া থেকে আব এক পাড়ায় গেল মাত্র।

তারপরে মিলুব বিয়ে হলো, টুনটুনের বিয়ে হলো, খালি হয়ে গেল বাড়ি। সব মেয়েব বিয়ের কষ্টই সমান তীব্র হয়ে বিদ্ধ করলো হৃদয়। বয়েসও ততোদিনে অনেক এগিয়ে গেল, চুল পেকে গেল, সংসার ধর্ম শেষ হয়ে এলো, কেবল ছেলে নীলেন্দু যার ডাক নাম নীল, সে তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শেষ করে বেরোয়নি। শূন্য বাড়িতে নীলই তার বয়স্ক পিতামাতার কাছে দিদিদের পরিপূরণ। নীলই বাড়ি ভরে রাখে। নীল বুদ্ধিমান, নীল সংবেদনশীল, ছবি বিষয়ে বোধ তার সহজাত। বাবার সে বন্ধু। সন্তানদের মধ্যে হয়ত বা কিছুটা বেশী আদরেরও। ছেলেকে সন্দীপন সর্বতোভাবে তার মায়ের দায়িত্বে ফেলে রাখেনি। নিজের কাছে শুইয়েছে, নিজের সঙ্গে খাইয়েছে, বেড়াতে নিয়ে গেছে, গল্প বলেছে, ছবি চিনিয়েছে, পাশে বসিয়ে আঁকার জন্য অজস্র রং তুলির

অপচয় ঘটিয়েছে।

একমাত্র ছেলে বলে নয়। ছেলে বলে আলাদা কোনো সংজ্ঞা ছিলো না। একটা কারণ সকলের চেয়ে ছোটো, অন্য কারণ ততোদিনে সন্দীপন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বদলেছে। এই শিশুটিকে তার ভালো লেগেছিলো। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিলো, একে আমিই শিক্ষিত করবো, আমিই সহবৎ শেখাবো, দেবযানীকে দেখিয়ে দেব কেমন ভালো বাবা আমি। আমার শিক্ষায় ছেলে কেমন মানুষ হয়।

হেমলতা কাশী থেকে ন'দশ মাসের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন। কাশীতে যে পরিবারের সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো, তারা ওখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা এবং এক ধর্মপ্রাণ নিঃসন্তান দম্পতি। অনেক আগে হেমলতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো। হেমলতা নিজেই তাদের চিঠি লিখে এই বাসস্থান ঠিক করেছিলেন। তাঁদের নিজেদের বাড়ি সেখানে, খুশি হয়েই তাঁরা একখানা ঘর বাথরুম আর রান্নাঘর আলাদাভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ভাড়াও নিতে চাননি। যদিও সন্দীপন রাজী হয়নি সেটাতে। কিন্তু সেখানে থাকতে পারলেন না। কী মনকষাকষি করে চলে এলেন।

আসলে আসবার জন্যই এলেন। ছেলেকে ছেড়ে থাকা সত্যি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তা আসুন। দেবযানী খুশিই হয়েছিলেন। কেবলি মনে হচ্ছিলো, তাঁরই তো সব, অথচ তাঁকেই কেমন জায়গা ছেড়ে দিতে হলো অন্য একটি মেয়ের জন্য। নাতিনাতনী মানুষের কতো আদরের, তার মধ্যে এই প্রথম। নিশ্চয়ই হেমলতার কতো দেখতে ইচ্ছে করছে। অথচ পারছেন না। এমনও ভেবেছিলেন বাচ্চা নিয়ে, বড়োদিনের ছুটিতে কাশী যাবেন। কিন্তু খুব আশ্চর্য, যে মায়ের জন্য সন্দীপন অত কান্না কেঁদেছিলো, তিনি ফিরে আসাতে কিন্তু একটুও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো না। অনুত্তেজিত গলায় বললো, 'একি তুমি?'

হেমলতার মুখে বেদনার ছায়া পড়লো, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাড়িয়ে

দিবি নাকি ?'

'আসবে বলে কোনো চিঠি লেখোনিতো।'

'কেন, চিঠি না লিখলে কি আসা যায় না ?'

দেবযানী মেয়ে কোলে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন। নাতনীর দিকে তাকিয়ে হেমলতার চোখের তারায় আগ্রহ ফুটলো। হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন। শেষ পর্যন্ত নাতনীর টানেই হয়তো ছেলেব প্রতি আর ততো উগ্র রইলেন না। নাতনীকে আদর করতে করতে প্রায়ই বলতেন, 'শত্রুর পেটে বান্ধবের জন্ম।' একথাটা আঘাত দিত দেবযানীকে। সন্দীপনের কানে গেলেও সে কড়া চোখে তাকাতো। মাকে কাছাকাছি দেখলে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলতো, 'এসব বাজে আদর করবে না তো। বাজে কথা শেখাবে না।'

আগের দিন হলে এই কথাতেই কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতো। কিন্তু কাশী থেকে ফেরার পরে মনে হচ্ছে, কোথায় তিনি বুঝতে পেরেছেন এই ঝগড়ার ফলাফল তাঁর পক্ষে খুব বেশী শুভ হবে না। তাছাড়া মাত্রই ন' মাসের ব্যবধানে আর্থিক অধিকারও চলে গেছে দেবযানীর হাতে। এসেই অবশ্য তার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সন্দীপন খুব কঠোরভাবেই সেটা হতে দেয়নি। দেবযানীর লজ্জা করেছে, কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করে কাটিয়ে উঠেছেন সেই লজ্জা।

সংসার চালাবার দায়িত্ব হাতে নিয়ে প্রথম প্রথম যথেষ্ট হাবুডুবু খেয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধারের বহর দেখে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। মুদি দোকানের ধার, মনোহারী দোকানের ধার, এর ওর তার কাছে খুচরো দেনার ধার, কত ধার যে চারিদিকে ছড়ানো তার ঠিক নেই। সন্দীপনকে বলতেই সে বলেছে, 'আমি তার কী জানি। সব তো মা-ই করেছেন। যা উপার্জন করি নিশ্চয়ই তাতে চলেনি।'

মাসের প্রথমেই সব দেনাদার এসে হাজির হয়, দেখে ভয় করে দেবযানীর। এতো দেনাদার শাশুড়ি ঠেকাতেন কেমন করে ভেবে পান

না। বিপন্ন হয়ে সন্দীপনকে বলেন, 'এই ওঠো, খববেব কাগজওলা বলছে আট মাসের বাকি।' অথবা, 'শোনো, মুদি নাকি ছমাস টাকা পায়নি', অথবা, 'কয়লাওলা এসে ভীষণ রাগারাগি করছে –'

সন্দীপনের সকালবেলার ঘুম ছুটে যায়, ঘামও ছুটে যায়। বিড়বিড় করে বলে, 'কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য!'

আশ্চর্য নিশ্চয়ই। একমাস দুমাস সংসার চালিয়েই দেবযানী দেখেছেন, সন্দীপন যা মাইনে পায়, এবং ছবি থেকে যা উপার্জন করে, সাবধানে চললে এরকম ধাব হবার কথা নয়। অপচয়ের অভ্যাস এদেব মা ছেলে দুজনেরই সমান, সেটা দেবযানী লক্ষ্য কবেছেন। যেমন বাড়িতে দুজন লোক খাবে খাবার দাবাব এতো বেশী হবে যে প্রায় দুগুণ ফেলা যাবে। আন্দাজ পান না হেমলতা কিন্তু তাঁর উপবে কথা চলে না। নইলে রমেশের মার আন্দাজ আছে এ বিষয়ে। ক'জন খেলে কী লাগবে না লাগবে বলতে পারে। উনি রেগে যান। আবাব বাড়তি খাবার যে যত্ন করে শুকিয়ে বা জলে বসিয়ে রেখে দেবেন পরেব দিনের জন্য তা করবেন না। কবতেও দেবেন না। অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করলেই অসম্মান বোধ করেন। সন্দীপনের জুতো জামা রোজ হারাচ্ছে রোজ কেনা হচ্ছে। কেনার পরে হয়তো দেখা গেল কোন কোণায় পড়ে আছে। তখন পেয়ে আর কী লাভ। ফেলে দাও, ফেলে দাও। 'ফেলে দাও, ফেলে দাও' রবটা সন্দীপনের। এটা শুনে আবার হেমলতা রাগ করেন, ঝাঁঝি দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তোমাব তো ফেলে দাও বললেই হলো, আসে কোথা থেকে শুনি? পয়সা লাগে না কিনতে? কতো পয়সা রোজগার করো।'

জীবন-যাপনের প্রতিটি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এদের এই অপচয়। দেবযানী দেখেছেন মাসের পনেরো তারিখের মধ্যেই হেমলতার হাহাকার 'টাকা নেই, টাকা নেই, টাকা দাও, টাকা দাও।' বেচারা সন্দীপন! অমনি ছুটলো বিজ্ঞাপনের আপিসে আপিসে। যতো আজেবাজে কাজ

যোগাড় করে আনলো, সেই সুবাদে অগ্রিমও পেলো কিছু। কিন্তু কাজের তুলনায় ন্যূনতম মূল্যে। ব্যবসায়ী হাড়ে হাড়ে লোক চেনে, আর সন্দীপনকে চিনতে তো তাদের একপলকের বেশী খরচ করতে হয় না। অভাবের তাড়নাই যে তাকে তাদের কাছে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে তা তারা জানে, জলের মতো নিভাঁজ মানুষ সন্দীপনের মুখেও তা লেখা থাকে, বাক্যেও সেটা গোপন করার কোনো চেষ্টা থাকে না। এই করে কবে পঞ্চাশ টাকার জিনিস কতোবার পাঁচ টাকায়ও তার বিক্রী করতে হয়েছে।

সেজানোর নকলে খাবার টেবিলের একটা স্টীল লাইফ ছবি এঁকেছিলো। কী সুন্দর ছবিটা। বেশ দাম উঠেছিলো। কিন্তু দেবযানী দেননি। সন্দীপনও প্রাণে ধরে বিক্রী করতে পারেনি। দেনার দায়ে মায়ের চ্যাচামেচিতে কখন সেটা কাগজমুড়ে নিয়ে যে বেরিয়ে গেল কে জানে? বিনিময়ে মাত্র নটি টাকা এনে ছুঁড়ে দিল মায়ের দিকে। অথচ পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিলো, বিক্রী না করে দেবযানীর অত প্রিয় ছবি দেবযানীকেই উপহার দিয়েছিলো। শেষে দেবযানীর অজান্তেই এই গতি হলো।

যখনই এই ধরনের কোনো প্রয়োজনে মায়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে এভাবেই জলের দরে সন্তানের অধিক প্রিয় ছবি সব বিক্রী করতে নিয়ে যেতো দেবযানীর ভীষণ কষ্ট হতো। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতেন, তিনি যদি কখনো সংসারের ভার হাতে পান, মরে গেলেও সন্দীপনকে এসব অসম্মানের বেদনা বহন করতে দেবেন না। না খেয়ে মরে গেলেও না। কিন্তু সত্যি যখন সে ভার হাতে পেলেন, অনেক হাবুডুবু খেলেন। সামলে নিতে সময় লাগলো। তবে সামলে নিতে পারলেন। সামলে নেবার সিঁদকাঠিটি তিনি পরিশ্রম, মনোযোগ এবং বুদ্ধির দ্বারাই হস্তগত করলেন। এককণা তণ্ডুলও অপচয় হতে দেব না। একটা জিনিসও বিশৃঙ্খলভাবে রেখে নষ্ট করবো না, যা আছে তার সদ্ব্যবহার করবো

এবং অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করবো না এই মূল মন্ত্র মনে রেখেই তিনি শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরলেন।

ধার শোধেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল বলা যায়, দৈব সহায় হলো। দিল্লী থেকে এক ভদ্রলোক এলেন, তাঁদের বাড়িতেই উঠলেন। দেবযানীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খুব শহর দেখে বেড়ালেন কদিন। কলকাতা তাঁর এই প্রথম আসা। যাবার আগের দিন হঠাৎ বললেন, 'ওঃ হো, আমার মেয়ের জন্য তো একজোড়া সোনার বালা কিনে নিয়ে যাবার অর্ডার ছিলো। তোমার কোনো চেনা দোকান আছে? কিনে দিতে পারবে সঙ্গে গিয়ে।'

দেবযানী বললেন, 'ঠিক আছে। এখন বেলা হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করুন। বিকেলে বেরুবো। আমি সেদিন আপনার সঙ্গে আশুতোষ মুখার্জী রোডের ফুটপাত দিয়ে হাঁটবার সময়ে একটা সোনার দোকান থেকে এক ভদ্রমহিলাকে একজোড়া বালা কিনে হাতে পরে বেরুতে দেখলাম।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, 'একেই বলে মেয়ে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে গয়নার দিকে নজর চলে গেল।' দেবযানীও হাসলেন, 'কী করবো, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি মেয়ের বৃত্তি নিয়েই তো জন্মাবো আর একথাও সবাই জানে সব সুকুমার বৃত্তিই মেয়েদের একচেটিয়া। যার নাম অলঙ্কার, অর্থাৎ বাহুল্যের শোভা, তার প্রতি আকর্ষণ তো থাকবেই তাদের। কিন্তু চলতে চলতে দেখিনি, দাঁড়িয়েই দেখেছি।'

'ও একেবারে দাঁড়িয়েই পড়েছিলে, কখন? আমি তো টের পাইনি।'

'কী করে পাবেন? আপনি যে তখন ছেলের বৃত্তি নিয়ে একজন ছড়িওলার কাছে ছড়ি দর করছিলেন।'

একথা শুনে ভদ্রলোক একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন। 'যাক, খুব ঠুকে দিয়েছ। খুব ঠুকে দিয়েছ।'

এরপরে হাসি সম্মিলিত হলো।

চৌদ্দ

সেই বালা কিন্তু সেদিন দেবযানী সেই দোকান থেকে কিনলেন না। দুপুরে শুয়ে শুয়ে একটা চিন্তা এলো মাথায়। তাঁর নিজের বালাটা বিক্রো করে দিলে কেমন হয়? বিয়ের পর থেকে বাকসেই তো পড়ে আছে, তেমন পছন্দও না, পরেনও না। আর হাতে তো শুধু বালাই নয়, চুড়ি আছে, চুড় আছে, ব্রেসলেট আছে। চুড়িগুলো পরেন, আওয়াজটা খুব ভালোবাসে সন্দীপন। কিন্তু বালা আর ব্রেসলেট ছুঁয়েও দেখেন না। ঐ বিয়ের দিন আর বৌভাতের দিন যা। গয়না পরতে ভালো লাগে না। সন্দীপনও ভালোবাসে না। এতো গয়না পরে যাবেন বা কোথায়। বরং বেচে দিয়ে একচোটে যদি সব দেনাগুলো মোটামুটি শোধ করে দেয়া যায় তাহলে তাগাদার অপমানটা আর সহ্য করতে হয় না রোজ রোজ। তারপরে একটা পয়সাও ধার নয়। না, আর একটা পয়সাও ধার নয়। মনে মনে শপথ করলেন। ধারের লজ্জা তুলনাহীন।

ভদ্রলোককে নিলেন না। বাচ্চা নিয়ে, রমেশের মাকে নিয়ে দুপুরের নিরিবিলিতে বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই বড়ো রাস্তার ফুটপাতের উপর ঝকঝকে গয়নার দোকানটিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছোট্টো একটা কানের ফুল পছন্দ করতে করতে খুব সহজভাবে বালা জোড়া বার করে মাপিয়ে নিলেন, মাপটা লিখেও দিতে অনুরোধ করলেন একটা কাগজে। তারপর বললেন, 'কানের এই ফুলটা আমি কাল আবার এই সময়ে এসে নেবো। আজ থাক।'

বাড়ি এসে ভদ্রলোককে দেখালেন সেই বালা, ওজন দেখালেন, শেষে বললেন, 'যদি পছন্দ হয় কিনতে পারেন। শুধু সোনার দাম, মজুরি লাগবে না।'

ভদ্রলোক বালা জোড়া দেখতে দেখতে বললেন, 'কেন?'

'এক ভদ্রমহিলার বালা, ডিজাইন পছন্দ নয় বলে মজুরি ছাড়াই বিক্রী করতে চাইছেন। আমি ওজন করিয়ে এনেছি।' ভদ্রলোক আর

দ্বিরুক্তি না করে তখুনি খুব আগ্রহের সঙ্গে কিনে নিলেন। প্রায় সব ধার শোধ হয়ে গেল সেই টাকায়। একজোড়া কানের ফুলও এলো পরের দিন। বুলুর দামী ফ্রক এলো, রমেশের মার শাড়ি এলো, সন্দীপনেব জন্য রুমাল এলো একডজন, যেন নিজের রোজগারে এতো কিছু করতে পেরেছেন এই অনুভূতিতে বুকের ভিতরটা ছলছল করতে লাগলো। সেই সঙ্গে আবো একটা মূল্যবান সত্য তিনি আবিষ্কার করলেন যে, বিপদে পড়লে উত্তীর্ণ হবার এই বাস্তাটিই সবচেয়ে সহজ পথ।

আর এক পয়সাও ধার নয়, জীবনে এই প্রতিজ্ঞাটা অদ্যাবধি অক্ষয় কবজের মতো রক্ষা করতে পেরেছেন। না, সন্দীপনকে আর কোনোদিন কোনো অবমাননা সহ্য করতে দেননি। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে চাল আনতে পাঠাননি। তেলের বিজ্ঞাপন আর সিগরেটের বিজ্ঞাপন আঁকতে বাধ্য করেন নি।

সন্দীপন অবিশ্যি কোনোদিনই জিজ্ঞাসা কবেনি দেনাদাররা আর আসে না কেন, মাসের মাঝখানে আর হাহাকার ওঠে না কেন, একটি শিশুসহও (যা আগে ছিলো না) সংসার কেমন করে এমন মসৃণভাবে চলে। গায়ে পড়ে দেবযানী দু একবার বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম প্রথম নিতান্তই ছেলেমানুষি চাপল্যে স্বামীর কাছে একটু প্রশংসা পাবার লোভ হয়েছে কিন্তু বারে বারেই তা সন্দীপন প্রতিহত করে তখনকার মতো হতোদ্যম করলেও অজানিতভাবেই তাঁর অন্তরকে নিষ্কাম হবার দীক্ষা গ্রহণে সমৃদ্ধ করেছে। আর হতোদ্যম হয়েও যে আবার উদ্যম ফিরে পেয়েছেন তারও যে কোনো কারণ নেই তা নয়। এসব জিজ্ঞাসা না করাই তার স্বভাব। সে হিসেব নিকেশের অধীন মানুষ নয়। আজ পাঁচ টাকা দিয়ে পাঁচশো টাকার কাজ কী করে হলো সেটাও যেমন তার বিস্ময় উৎপাদন করে না, তেমন পাঁচশো টাকা দিয়েও

পরের দিন খরচ হয়ে গেছে বললে সে অবাক হয় না। সুতরাং কাটাকাটি হয়ে যায় সব।

তবে হেমলতা চলে যাবার পর থেকে সাংসারিক জীবনে যে বেশ একটা শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে ঝগড়াঝাটি নালিশ চ্যাঁচামেচি কিছুর জন্যই যে আর উত্ত্যক্ত হতে হচ্ছে না, ধারদেনার তাগিদায় জর্জরিত হতে হচ্ছে না, সেটা এতো প্রত্যক্ষ যে মাঝে মাঝেই স্ত্রীকে সেজন্যে ধন্যবাদ দেয়। বলে, 'জানো, আমি যখন তোমাকে বিয়ে করি, মাসিমা বলেছিলেন, মাকে না হয় শাকভাত খাইয়ে রাখিস, বৌকে খাওয়াবি কি? আমি বলেছিলাম, ঐ শাকভাতই খাবে।'

'আর থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে চাইবে যখন?'

'চাইবে না।'

'না? চাইবে না!'

আমি বললাম, 'তোমরা যেসব মেয়েদের চেনো, আমার বৌ সে দলের নয়।'

মাসিমা বিদ্রূপ করলেন, 'তবে কোন দলের? স্বর্গ থেকে নামেনি তো?'

বললাম, 'অসাধারণ যখন তখন ভেবে নিতে দোষ নেই।'

নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন, 'দেখবো, সবই দেখবো। এসব ভাব ভালোবাসার বিয়ে কদ্দিন টেকে জানা আছে আমার।' আমি আর রাগে কথা বললাম না। এখন মনে হচ্ছে ঐ জঘন্য মহিলাটিকে ডেকে বলি—কী বলবো বলতো? হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয় দেবযানীকে। কী বলবে সেটা আর বলা হয় না।

সকালে উঠে দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুলে হেমলতাকে আগত দেখে যে সেদিন সন্দীপন তাঁকে স্বাগত জানাতে পারেনি সেটা সেই শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কাতেই। একটু পরেই অবশ্য আনন্দিত কণ্ঠস্বরে

ভবে ফেললো বাড়ি। নিজেই ছুটে গিয়ে কতো কিছু নিয়ে এলো, যতোক্ষণ আপিসে না গেল ততোক্ষণই বসে থাকলো মায়ের কাছে। কিন্তু সংসারেব ভাব থেকে হাত গুটোতে দিল না দেবযানীকে। কয়েকদিন বাদে যখন মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরলো, টাকাটা দেবযানীব কাছেই দিল। দেবযানী সংকোচেব সঙ্গে বললেন, 'মাকে দিলে না?'

সন্দীপন বললো, 'তোমাব মেয়ে, তোমার স্বামী, দায়িত্বও নিশ্চয়ই তোমার। মা বিশ্রাম করুন।'

'মা রাগ করবেন। কাল বলছিলেন—'

'কী বলছিলেন?'

'মাইনে পেয়েছো কিনা, ওঁর হাতে নাকি একটাও পয়সা নেই।'

'ঠিক আছে। পয়সা নেই পয়সা দেয়া যাবে। সংসাবের মধ্যে আব মাথা না গলানোই ভালো।'

মায়ের সঙ্গেও সে এ বিষয়ে কথা বললো, 'তুমি কি মনিকে আমি মাইনে পেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস কবেছো?'

'হ্যাঁ।'

'পেয়েছি।'

'পেয়েছিস? কোথায়? দে।'

'মনিকে দিয়েছি।'

থমকে গেলেন। সন্দীপন বললো, 'ওর সংসাব ও-ই করুক।'

'ওর সংসার?'

'আমি তোমাকে যা লাগে আলাদা দিয়ে দেব। গোলমাল আমার ভালো লাগে না।'

সাপের ফণা আবার উদ্যত হলো, 'তার মানে তুই আমাকে তোর বৌয়ের দাসী করে রাখছিস।'

'না। ভিন্ন করে রাখতে চাইছি। তুমি তো ওকে পছন্দ করো না, মিছিমিছি কী দরকার একসঙ্গে থেকে? ঘর তো তোমার আলাদাই, খাওয়াও তোমার আলাদা, যদি চাও একটা ছোটো বাচ্চা মেয়ে খুঁজে

আনতে পার তোমার নিজস্ব কাজের জন্য—'

প্রায় একটা ফরমান জারি করেই সন্দীপন বেবিয়ে গেল তার কাজে। হেমলতা নিজের ঘরে গিয়ে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

খুব আশ্চর্য। সেই রাগ দুঃখ অভিমানকে তিনি খুব বেশাদূর নিয়ে গেলেন না। যতোটুকু অশান্তি কবলেন পূর্বের তুলনায় তা নেহাৎই নগণ্য। আসলে, তিনি বুঝে গেছেন তাঁর আসন তাঁর নিজের পদাঘাতেই উল্টে গেছে। আব ছেলেকেও চেনেন। যা সে ভেবেছে তাই সে বলেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

পনেরো

বিবাহের বারো বছরের মধ্যে তিনটি কন্যা জন্ম নিল। সেই বারো বছরে সন্দীপন মিত্রের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। চিত্রকর হিসেবে তো বটেই, নিয়ম-নিষ্ঠা পাণ্ডিত্য রুচি এসব বিষয়েও সে প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য হলো। স্বামীর গৌরবে বুক ভরে যায় দেবযানীর। সংসারের সমস্ত চিন্তা ভাবনা গ্লানি থেকে ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টায় আপ্রাণ হন।

খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও কিছু হযেছে বৈকি। তবে ততটা নয় যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। খরচও তো বেড়েছে। তিনটি সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করা কম কথা নয়। অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করবো না সেই প্রতিজ্ঞা এখানে তাঁর খাটেনি। শহরের সেরা ইস্কুলে পড়াবার সঙ্গতি সত্যিই তাঁর নেই। একটি হলেও বা হতো। তবু সেই সেরা ইস্কুলেই ভর্তি করেছেন। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন। শিশুদের সম্বন্ধে এই তাঁর অভিমত। কিন্তু তিনটিকে সমানে ঐ ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে এবং চালিয়ে নিতে সব সময়েই গলদঘর্ম। বন্ধু সমাগম অবারিত। তাদের আপ্যায়ন করতে হয়।

বন্ধুদের তো ভালো, তুচার কাপ চা আর সামান্য খুচরো খাবার হলে ঢের। কিন্তু আত্মীয়রা এসে যখন বহাল হয় তখন পড়েন মুশকিলে। সেখানে তো শুধু খরচের প্রশ্নই নয়, খাটুনিরও প্রশ্ন। তার উপরে হেমলতা এখন একান্তভাবে অচল। বাথরুমটুকুতে যাবারও ক্ষমতা নেই। সব বিছানায়। তাও তো করতে হয় দেবযানীকে। এখন তিনি দেবযানী অন্ত প্রাণ। মুহুর্মুহু ডাকছেন, খেয়েও খাবার চাইছেন, তুড়ে গালাগালি দিচ্ছেন ছেলেকে—শেষবার তিনি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেই কাশী গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন অসুস্থ হয়ে। চিকিৎসা করে ভালো হলেন বটে কিন্তু শয্যা ছাড়তে পাবলেন না, জ্ঞানগম্যিও কমে গেল। সেই দায়িত্বও তো কম নয়।

মাঝখানে খেয়াল হলো সন্দীপনের, 'আরে, তুমি দেখছি আবার ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছো।'

দেবযানী বললেন, 'সময় পাই না।'

'ওসব বাজে অজুহাত। কেবল সংসাব আর সংসাব। ওসব ছাড়তো।'

'ছেড়ে?'

'আমার মতো সারাদিন ছবি আকবে। আপিসে যেতে হয় যাই, কিন্তু মন আমার রং তুলিতে। তোমাকেও ওরকম হতে হবে।'

দেবযানী হাসেন। আবার রাগও করেন। বলেন, 'মরে গেলেও তো তুমি একবিন্দু সাহায্য করবে না। ঘরে বাইরে সামাল দিতে আমার যে কতো কষ্ট হয় ভাবো সে কথা?'

'ভাবি, ভাবি। আমাকে একটা বই কিনে দেবে মনি?'

'কী বই?'

'দা ভিঞ্চির জীবনী। উঃ কী যে কিনতে ইচ্ছে করছিলো কাল বইয়ের দোকানে গিয়ে। কী সুন্দর গন্ধ বইটার—'

সন্দীপনের চোখে যেন ভালোবাসার সহস্র আলো জ্বলে ওঠে বলতে

বলতে।

দেবযানীর মুখ ম্লান হয়। কী করে দেবেন। টাকা কোথায়? মাসের আরো কতোদিন বাকি এখনো। তবু বলেন, 'কতো দাম?'

'পঁয়ষট্টি সত্তরের বেশী নয়। মস্ত বই। কী সব ছবি!'

পঁয়ষট্টি সত্তরের বেশী নয়। বেশ আছে। তখনো চাল কেজি হিসেবে বিক্রী হতো না, এক কিলো মাছের দাম দু'টাকার বেশী ওঠেনি, দুধের সের বারো আনা, ভালো ঘি পাঁচ টাকা। কতো মানুষের সংসার ওতেই চলে যেতো।

কেউ পাঁচশো টাকা মাইনে পেলেও উল্লেখ করার মতো বড়লোক। ভালো বাড়িতে থাকে, গাড়িও চড়ে। তবে উপার্জনের পরিধিও বেশী ছিলো না। আর চাকরির দরজাই বা কটা খোলা ছিলো। হয় মাস্টারি, নয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কেরানী; নয় ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালালি। দু চারটা ইংরেজ কোম্পানী, ওলন্দাজ কোম্পানী ইত্যাদি ফার্মও ছিলো বটে, নেহাৎই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর কাজ জুটতো সেখানে। আরো ছিলো কিছু যেমন রেল বা পুলিশ, বা অমুক বা তমুক, মোট কথা সবই হাতে গোণা যায়।

সন্দীপনের আয়ও বলা যায় অনেকদিন যাবতই প্রায় সেই উচ্চ মধ্যবিত্তদের পর্যায়েই এসে পড়েছে তবু এতো ধরনের খরচ যে হাজার হিসেব করে চলেও কিছু থাকে না হাতে। এই বই কেনার খাতেও তো কম যায় না প্রত্যেক মাসে?

স্ত্রীকে চুপ করে চিন্তা করতে দেখে সন্দীপন উৎসাহিত হল, 'কী ভাবছ? দেবে?'

দেবযানী আস্তে বললেন, 'দেখি।'

ছবিটবি ফেলে উঠে এলো সন্দীপন, 'উঃ তুমি কী ভালো, তুমি কী ভালো—'

দেবযানী এঘরে এসে তাঁর সঞ্চয়ের কৌটোটি হাতে তুলে ওজন

দেখলেন। প্রথমে দু' আনি জমাতেন, তারপরে একটা সিকি, এখন আধুলি। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই উন্নতি সাধন হয়েছে। কিছুই তো নেই, বাচ্চা নিয়ে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ি নিয়ে আর একটি অবুঝ স্বামী নিয়ে ঘর করা, যা পারেন এভাবেই রাখেন। খরচের হাত স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সমান ঢিলে। একজন করেন বন্ধুকৃত্য, আবেকজন করেন আত্মায়কৃত্য। সন্দীপনের বন্ধুকৃত্যের মধ্যে তার নিজেরি আনন্দ, তাদের নিয়ে তর্কে-বিতর্কে আড্ডায় সে সমৃদ্ধ হয়, সুখী হয়, দেবযানীব আত্মীয়কৃত্যেব বেশী ভাগটাই দায়, কর্তব্য এবং চক্ষুলজ্জা। সন্দীপন অবশ্য সব সময়েই আপত্তি করে তা নিয়ে, বলে, 'এসব লোক দেখানো ভদ্রতাগুলি ছাড তো, কাউকে অত আদব যত্ন করতে হবে না।'

দেবযানী বলেন, 'তা হয় নাকি ? বাড়িতে অতিথি এলে আদর-যত্ন করবো না ?'

'না। তোমার তাতে কী লাভ হয় খাটুনি ছাড়া ?'

'ভদ্রতা কি মানুষ লাভ লোকসান ভেবে কবে নাকি ? তোমাব বন্ধুরাই বা আমার কে ? আমি কি তাদেব আদব-যত্ন করি না ? এই তো দুখানা ঘরের মধ্যে বসবাস, আমার ব্যক্তিগত বলে কিছু আছে নাকি ? কোথায় বসি কোথায় শুই বলো তো ? দিনে পঁচিশ তিরিশ কাপ চা হয়, সব বন্ধুই কি তোমাকে সমান ভালোবাসে বা সমান যোগ্য ? পথের ধারে বাড়ি, এলেই এক কাপ পানীয় পাওয়া যাবে জানে, তাছাড়া যদি কারো সঙ্গে সুবিধেজনক জায়গায় মিলিত হবাব কথা থাকে, সেটাও এখানে—'

'তা ঠিক।'

'তবে ?'

'কিন্তু আমার যে সব বন্ধুকে আমি ভালোবাসি বা মর্যাদা দিই, তারা কিন্তু তোমাকে ভীষণ এ্যাডমায়ার করে। চোখ টিপে বলে, দেশের সর্বজন স্বীকৃত চিত্রকরটির অবস্থা তো বেশ কাহিল।'

একটু আরক্ত হন দেবযানী। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু কী ভাবে

কী অল্প বয়সেই না মারা গেলেন ভদ্রলোক। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত, 'কই, কোথায় আপনারা? আমি এসেছি—'

দেবযানী বেরিয়ে এলেন, এসেই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বাথরুমে একটা তোয়ালে আর জামা রেখে এসে বললেন, যান যান শীগগির মাথাটা মুছে জামাটা বদলে আসুন।'

এই দুর্দান্ত আঁকিয়েটি বিশেষ ফর্মালিটির ধার ধারেন না, বরং কিছুটা চাষাড়েই বলা যায়।

বলে উঠলেন, 'ঠিক। ঠিক বলেছেন। বাঃ এই রকম মনোযোগ না হলে গৃহিণী? আচ্ছা আপনার সঙ্গে আপনার বিয়ের আগে কেন আমার দেখা হয়নি বলুন তো?'

সন্দীপন সান্ধ্যস্নান সেরে তৈরি হচ্ছিলো শোবার ঘর থেকে বসবার ঘরে আসবার জন্য। মাথা আচড়াতে আচড়াতে বললো, 'আমি কি সব শুনতে পাচ্ছি।' হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো, 'দেখা হলে কী করতেন শুনি?'

'আপনি কী করেছেন? আমিও তাই করতাম। এ তো অতি সরল সত্য।'

মাথা মুছে জামাটামা বদলে এসে বসলেন। দেবযানী গরম চা আর নিমকি ভেজে এনে দিলেন, উপভোগ করলেন সেই খাদ্যপানীয়। তারপর ছবির বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত দশটা। যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে আবেগভরে সন্দীপনের হাত ধরলেন, বললেন, 'আপনাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, ভীষণ শ্রদ্ধা করি, আপনার সঙ্গে কথা বললে আমি আমার দিগন্ত দেখতে পাই। তা নৈলে পরস্ত্রী হরণে আমার বিবেক আমাকে বাধা দিত বলে মনে হয় না।'

এতোদিন বাদে সেই মানুষটিকেও মনে পড়ছে দেবযানীর। মনে পড়ছে সেই সঞ্চয়ের কৌটো উজাড় করে কীভাবে বইটা সন্দীপনকে

কিনে দিয়েছিলেন। সোনার অলংকার আর ততোদিনে বিশেষ অবশিষ্ট ছিলো না কিছু, এতোগুলো বছর অতিক্রান্ত হতে হতে কতো স্রোতে যে কতো ভেসে গেল ঠিক নেই।

বইটা কিনতে পেরে সন্দীপনেব খুশি আব ধবে না। ছেলেমানুষের মতো আঁকড়ে থাকলো কদ্দিন, সন্ন্যাসীর ঈশ্বর চিন্তার মতো নিবিষ্ট হয়ে ছবিগুলো দেখলো। সঞ্চয় সার্থক হল।

এইসব স্বার্থকতা কিনতে কিনতে উচ্চ মধ্যবিত্তের আথিক সুখ সব সময়েই পরমার্থের পায়ে নিবেদিত। তারি মধ্যে কেমন করে যে কখন রোদ উঠলো কে জানে। হঠাৎ মনে হলো সংসারের চাকাটা যেন বড়ো মসৃণ। আর আপ্রাণ হতে হচ্ছে না কোনো কিছুর জন্য। আসলে যুদ্ধের দয়ায়, ছবির বিক্রী হু-হু করে বেড়ে গেল। সদ্য আগত বিদেশীদের আনুকূল্যে অর্থাৎ আমেরিকানদের আনুকূল্যে পঁয়ত্রিশ টাকার ছবি পঁচাশি টাকায় বিক্রী হতে লাগলো। সেই মসৃণ গতিই বোধহয় সহ্য হলো না সন্দীপনের। অথবা মসৃণ গতিকে আরো মসৃণ করার খেয়াল চাপলো। আর খেয়াল চাপলে তো রক্ষা নেই। নিজের ইচ্ছের উপর আসক্তি তার বড়ো প্রবল। ইচ্ছেকে সে দমন করতে পারে না।

মাঝে মাঝে দেবযানী ঠাট্টা করতেন, 'ভাগ্যিস ঈশ্বর তোমাকে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছে করতে অক্ষম করে পাঠিয়েছেন ভবধামে নইলে একটা ভীষণ মন্দ মানুষ হয়ে যেতে পারতে।'

'তার মানে স্বীকার করছো এখন আমি ভালো।'

'ঐ আর কি—'

'অথচ আমার নিন্দে পেলে তো আহার নিদ্রা ভুলে যাও।'

'কী নিন্দে করি?'

'অযোগ্য পিতা, অযোগ্য স্বামী, অযোগ্য বাজার সরকার—'

'ঠিকই তো।'

'কিন্তু অযোগ্য প্রেমিক নই কী বলো?'

'তাতেও খুব বেশী নম্বর দেওয়া যাবে না।'

'কেন? কেন?'

'প্রেমের জন্য মানুষ কী না করে—তুমি কি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছের জন্য কিছু করো।'

'আমি তোমার পা ধুইয়ে দেবো।'

'আহা—'

'আকাশের তারা এনে ছিটিয়ে দেব—'

'আপাতত যদি মনখানেক কয়লা যোগাড় করে দিতে পারো তা হলেই ধন্য হবো।'

'ইস্পাহানের সোনা, লঙ্কা দ্বীপের মুক্তো—'

'তিনদিন যাবত হয়রান হয়ে যাচ্ছি, কোথাও কয়লা নেই। কী করি বলো তো?'

'গজমোতির মালা, হীরেখচিত কুণ্ডল—'

'চিনি পাওয়া যাচ্ছে না, চাল নিখোঁজ—আবার শুনছি—'

যে মানুষ আকাশের তারা আনতে চায়, ইস্পাহানের সোনা, লঙ্কা দ্বীপের মুক্তো আনতে চায়, তাকে দিয়ে কি কয়লা আনানো যায়? অতএব নবনিযুক্ত পরিচারক সনাতনকে সম্বল করেই ভাসতে হয় যুদ্ধের বাজারে। এখন তো সবই উধাও। হয় তিন গুণ দাম দাও, নয় কোনো হোমরা চোমরা বন্ধুকে ধরো। কী দিন গেছে। তারি মধ্যে লোকেরা কেমন হঠাৎ বড়লোকও হয়ে যাচ্ছে। কী কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি। সেই সময়েই সন্দীপন স্থির করলো সে ব্যবসা করবে।

প্রথমটায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন দেবযানী। পরে দেখলেন মোটেও হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়। লোকজন আসছে, বুদ্ধি-পরামর্শ হচ্ছে, চা সিগারেটের শ্রাদ্ধ হচ্ছে, কাগজ পেনসিল, হিসেব-নিকেস কিছুর কোনো কমতি নেই। খুব ব্যস্ত সন্দীপন। সুযোগ পেলেই দেবযানীর আঁচল চেপে ধরে বসিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে, 'কী রকম লাভ

হবে, লাভ হলে সেই টাকায় ব্যবসা আরো কতো বাড়াবে, টাকার সিংহাসনে বসে দেবযানীর আর কোনো খাটুনি থাকবে না, মায়ের জন্য টুপিপরা নার্স আসবে, আয়া আসবে তাঁর নোংরা পরিষ্কার করবার জন্য, রমেশের মা মেট্রন হয়ে যাবে, সনাতন হবে হেড কুক—'

এতো সব ভাবা হয়ে গেছে কিন্তু ব্যবসাটা ঠিক কিসের হবে সেটাই ভেবে উঠতে পারছে না। পরামর্শদাতারা বলেছেন, সব চেয়ে ভালো হবে পটারি, মাটির বাসন। একজন এক্সপার্ট আছে এ বিষয়ে, সেই সব ম্যানেজ করবে, সন্দীপনের কাজ শুধু ডিজাইন করা। কী কী বাসন হবে তাও নির্দিষ্ট হয়েছে। বিশেষ বিশেষ গড়নের কাপ, প্লেট, ছোটো বড়ো থালা, ফিঙ্গার বোল ফ্রুট বোল জলের কুঁজো আবার ওদিকে ফুলদানি টেবল ল্যাম্প কর্ণার টেবিলের স্ল্যাব—কতো সাহেব বন্ধু সন্দীপনের, এ সব 'হ্যাণ্ড-পেইন্ট' জিনিস দেখলে তারা তো মূর্ছা যাবে। তাদের সুবাদে বিদেশে ইমপোর্ট করা হবে, অর্ডারে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। মাটি আসবে সিংভূমের খনি থেকে, বাসনের জন্য সেই মাটিই মাটি, যাকে বলে চীনে মাটি।

এই সব ভয়ানক কথা শুনে দেবযানীর চোখ ঊর্ধ্বে উঠে যায়। তিনি নরমে-গরমে বোঝাতে থাকেন যে 'ও-ধরনের কাজের পক্ষে সন্দীপন মোটেই উপযুক্ত নয়। পটারির সে কিছুই বোঝে না।'

'বুঝি না মানে?' সন্দীপন চটে ওঠে, 'সব বুঝি। এর মধ্যেই আমি দশ রকম সেইপের কাপ প্লেট এঁকে ফেলেছি। এই যে তোমরা চিরকাল একঘেয়ে ফুলকাটা প্লেট দেখে অভ্যস্ত, এবার দেখবে আমি তার মধ্যে এমন সব ছবি আঁকবো যে দেখলে জাপানীরা পর্যন্ত ট্যারা হয়ে যাবে। ফুলপ্লেট, হাফপ্লেট, কোয়ার্টার প্লেট—তারপর তোমার গিয়ে বাটি মগ কফি সেট—ওঃ মনি ভাবতে ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।'

'শোনো, আমি বলছিলাম, হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে তো তেমন পোক্ত নও তুমি? মানে—'

সন্দীপন আবার চটে ওঠে, 'পোক্ত নই কে বলেছে? তোমার চেয়ে অন্তত অনেক অনেক বেশী ভালো অঙ্ক জানি। শুনে রাখো, ম্যাট্রিকে আমি চুরানব্বুই নম্বর পেয়েছিলাম। তুমি শুধু দেখবে ব্যবসা কাকে বলে। বাঙালীরা নাকি ব্যবসা জানেনা, এবার আমি দেখিয়ে দেব।'

নিঃশ্বাস ফেলে দেবযানী বলেন, 'ঠিক আছে, বাণিজ্য করতে গেলে যে মূলধন লাগে তা কি আছে তোমার?'

সন্দীপন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, 'শীতলবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখো, বুঝলে?'

এই এক শীতলবাবু হয়েছে কদ্দিন ধরে। শীতলবাবুই ধ্যান, শীতলবাবুই জ্ঞান। যখন যাকে ধরে।

'শীতলবাবুই বলে দেবেন, মূলধনটা কোথায় আর তার তালিকাটা কী', বলে তালিকাটা নিজেই পেশ করলো, 'যদি টাকার কথা ধরো, হাজার তিনেক আমার ব্যাঙ্কে হবে, আমি হিসেব করে দেখেছি। আরো কয়েক হাজার এদিক-ওদিকে পাবো। যেমন স্টীফেন বলেছে তিনটে ছবি সে বিদেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবে যার দাম পাবো বাইশ শো টাকা। দুটো ছবি আর্ট গ্যালারিতে গেছে, তার দাম পনেরোশো, গবর্নরের এডিকং স্টুয়ার্ট নেবে বড়ো ছবিটা, দাম ধরেছে এক হাজার, আরো কয়েকজনের সঙ্গে অনেক ছবির দাম দস্তুর চলছে। আমাদের ফার্মও নেবে—ভেবে দেখেছি মরে বেঁচে দশ হাজার টাকা আমি সংগ্রহ করতে পারবো। এটা তো গেল টাকার তালিকা। আসল মূলধনটা কী শোনো, শীতলবাবু বলেন, আপনার চিন্তা কী মশাই, আপনি তো ক্রেডিটেই বেরিয়ে যাবেন। বুঝলে মনি, তুমি আমাকে যতো তুচ্ছ ভাবো আমি ততো তুচ্ছ নই। আমার নামডাক খ্যাতিপ্রতিপত্তি শিষ্য ভক্ত এই শহরে বড়ো কম নেই।'

একইরকম ঠাণ্ডা গলায় দেবযানী বলেন, 'প্রথমত দশ হাজার টাকা তুমি হাতে পাওনি, সবই কল্পনা। তাছাড়া এ দশ হাজারেই কি এই দক্ষযজ্ঞ সম্পন্ন হবে তোমার?'

'তা কী করে হবে ? তিনজন পার্টনার থাকবে। ঐ দশ দশ দশ।'

এর পরে দেবযানী চুপ করে উঠে যাচ্ছিলেন, সন্দীপনও সঙ্গে সঙ্গে উঠলো, কাঁধে হাত রেখে বললো, 'এই যে আমার কোনো কাজেই তুমি উৎসাহ দেখাও না তাতে আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।'

দেবযানী বলেন, 'হ্যাঁ, মেজাজেব একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তো তোমারই এক্তিয়ারে—'

'তোমার মেজাজেরও তো আমি কোনো তল পাচ্ছি না।'

'তল তুমি আরো অনেক কিছুরি পাবে না।'

'কী! কী বললে ?'

বললাম, 'তোমাকে আমি তলিয়ে যেতে দেবো না।' কক্ষ ত্যাগ করেন তিনি।

ষোলো

কতো যে অশান্তি হয়েছিলো এই পটারির ব্যবসা থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে তার ঠিক নেই। জমানো টাকা কাকে বলে তা সন্দীপন জানেনা। হঠাৎ ব্যাঙ্কের হিসেবে তিন হাজার টাকা জমেছে দেখে মাথা গবম। কিন্তু সেইটুকু জমার পিছনে যে দেবযানীর কতো প্রাণপণ চেষ্টা নিহিত আছে তাতো বোঝে না। অবিশ্রান্ত গুছিয়ে সংসার করতে করতে তিনি ক্লান্ত। অবিশ্রান্ত সংসারের অনুকোটি চৌষট্টি দাবী পূরণ কবতে করতে তিনি ক্লান্ত। অবিশ্রান্ত সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকতে থাকতে তিনি ক্লান্ত। মনের ছিলা অবিশ্রান্ত টান টান হয়ে থেকে থেকে এখন যেন ছিঁড়ে যেতে চায়।

'এক পয়সা ধার করবো না,' 'নিজের অবস্থার অতিরিক্ত এক পয়সা খরচ করবো না', 'সন্দীপনকে আর কখনো ছবি বগলে নিয়ে বিজ্ঞাপন আপিসের দরজায় দরজায় ঘুরিয়ে পয়সার জন্য অসম্মানিত হতে দেবোনা' এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে কোনোদিন তিনি নিজের দিকে তাকাতে সময়

পাননি। এই কিছুদিন মাত্র সেই পরিশ্রমে একটু বাতাস লেগেছে, অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারছেন সব, সনাতন নামে একটি কর্মিষ্ঠ পরিচারককে ভালো মাইনে দিয়ে রাখতে পেরেছেন, বাচ্চাদের এবং হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্যকারী পেয়েছেন রমেশের মাকে, সন্দীপনের খেয়াল-খুশিতেও নতুন পাল খাটিয়ে তার হর্ষবর্ধন করেছেন, তার উপরে ব্যাঙ্কের তলানিও একটুখানি উপরে উঠে এসেছে। বয়স তো বসে নেই, রোগ-শোক, ভাল-মন্দ তা-ও তো আছে। হঠাৎ বিপদে কার কাছে গিয়ে হাত পাতবেন? মানুষ পশু নয়, তার ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তার ক্ষমতা আছে, সঞ্চয় তাই মানুষেরই ধর্ম। 'পেলাম খেলাম দিলাম গালে, পাপ পুণ্য নেই কোনো কালে' এই নীতির বশবর্তী হয়ে থাকলে মানুষের চলে না।

বাইরে কবে কোন্ টাকা পাবে সেই ভরসায় দশ হাজার টাকা কবুল করা কক্ষনোই উচিত হবে না সন্দীপনের। শেষ পর্যন্ত সে যে মেনে নিল সে কথা তার জন্য দেবযানী ভগবানের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালেন। কিন্তু ব্যবসা যে একটা করতেই হবে সেই ঝোঁক তার কমলো না। অতঃপর চিত্রকলা বিষয়ে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল। মন্দের ভালো। এই বিষয়টা তার জ্ঞানের অন্তর্গত, এই বিষয়ে তার আদর্শ, মতামত, সম্যক্ সমালোচনা সবই মনের অজ্ঞান তিমিরে আলোর বর্তিকা জ্বালিয়ে দেবার উপযুক্ত। দেবযানীও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সন্দীপন আবার উন্মাদের মতো মাথা খাটাতে লাগলো কী রকমভাবে কোন সাইজের বই করবে, কেমন তার ছাপা হবে, কোন কাগজ কেনা হবে, ছবির প্লেট করতে উৎকৃষ্ট উপায় কোনটা—সেজন্য কতো দামী দামী বিদেশী চিত্রকরদের বইয়ের স্তূপ জমলো বাড়িতে, জমানো তিন হাজার টাকা ফুৎকারে উড়ে গেল। বইয়ের টাকা বলা যায় যা ভেবে-ছিলো তার অর্ধেক পেলো না। এক সঙ্গে পরপর ছাপা বই যখন বিভিন্ন চিত্রকরের বিভিন্ন মতামত ও বিভিন্ন ছবি নিয়ে ছাপা হয়ে বেরিয়ে এলো, বস্তুতই তার উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখে স্বামী স্ত্রী দুজনেই আনন্দে আত্মহারা

হয়ে গিয়েছিলো। যারা দেখলো সবাই মুগ্ধ হলো। সেই উপলক্ষে বাড়িতে একটা বিরাট পার্টির ব্যবস্থা হয়ে গেল, কতো লোককে যে নিমন্ত্রণ করলো সন্দীপন তার ঠিক নেই। সেই নিমন্ত্রণেই একজন বিশিষ্ট অতিথি হয়ে এসেছিলেন বিমলেন্দু রায়। সম্প্রতি একটা প্রেস কিনেছেন এবং ব্যবসায়ী জগতে একজন যোদ্ধা বলে খ্যাতি আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভদ্রলোক, অর্থাৎ এই বিমলেন্দু রায় নামের ব্যক্তিটি দেখা গেল বেশ ধারালো মানুষ। বুদ্ধি গভীর, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, মাথা ঠাণ্ডা। সংসার বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞান জলের মতো স্পষ্ট। পৃথিবীটাকে তিনি শীতল চোখে তাকিয়ে দেখেন। মনে হয়, খুব কম লোককেই বিশ্বাস করেন, কম লোককেই ভালোবাসেন। তবে বদান্যতা আছে। প্রয়োজনে হাত পাতলে স্বভাবত ফেরান না, নিজে থেকে শোধ না করলে তাগাদা দেন না কিন্তু ক্ষমাও করেন না। চেহারা পেটানো, রং তামাটে, সমস্ত ভঙ্গিতে দৃঢ়তার ছাপ। প্রথম যৌবনে সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিষয়ে অনুরাগী ছিলেন, বিমাতার শাসনে অচিরেই তা অন্তর্হিত হয়েছে। এবং সেই শাসনের গুরুভার সহ্য করতে না পেরে কুড়ি বছর বয়সে, বি এ পড়তে পড়তে একদিন নিজের বোনটিকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। তখন বোনের বয়েস তেরো। বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের লালনপালন করতে করতে কম খেতে খেতে বেশী খাটতে খাটতে, তেমন বেড়ে ওঠার অবকাশ পাননি। নৈলে দেখতে তিনি ভালোই।

গৃহত্যাগ করবার সময় সকলের অগোচরে আলমারি খুলে তাঁর নিজের মায়ের সব অলঙ্কার, (যার মালিক তখন তাঁর পিতার নতুন স্ত্রী) চুরি করে নিয়ে যান। এবং এই চুরিতে তাঁর বিবেক একবিন্দু কম্পিত হয় না। তাছাড়া প্রয়োজন মত সত্য গোপনেও তিনি দোষ দেখেন না। তিনি জানেন জীবনে সুখ নামক কোনো বস্তু নিতান্ত দুর্লভ এবং কেড়ে না নিলে সে ধরা দেয় না। জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে অর্থ, তা অর্জন করতে হলে ন্যায় অন্যায়ের হাল ধরে বসে থাকলে চলে না। আরো জানেন, স্ত্রীলোক হচ্ছে বেড়াল। আদরে রাখো ঘড়ঘড় করবে, সন্দেহ হলেই সরু দাঁতে নোখে টুঁটি ছিঁড়ে দেবে। খেতে দাও থাকবে, অভাব হলেই পরিত্যাগ করবে।

ব্যতিক্রম কি নেই? আছে। নিজের বোন। তাকে তিনি প্রাণতুল্য ভালোবাসেন। তার সুখ-দুঃখই তাঁর সুখ-দুঃখ। তাকে তিনি বোর্ডিংয়ে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, নিজের উপার্জন সব ঢেলে দিচ্ছেন তার স্বামীর আর সন্তানদের সুখের জন্য। বিবাহ করেছিলেন, টেকেনি। প্রেমে পড়েছিলেন, প্রবঞ্চিত হয়েছেন। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এখন তিনি সমাজের যে আসনে অধিষ্ঠিত সেখান থেকে সকলকে ধূলোবালির মতো মনে হয়। মৃদু হাস্যে মৃদুস্বরে বলেন, যে-কোনো সময়েই এরা চোখের কাঁকর হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু পলিস আছে। মহিলা দেখলেই উঠে দাঁড়াবেন, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হয়ে আনত হবেন, মোলায়েম করে হাসবেন, মিষ্টি করে কথা বলবেন, যদিও সব কিছুর মধ্যেই কৃত্রিমতা ফুটে উঠবে, এবং সেটা লুকোবার চেষ্টা করবেন না। বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যাবে বিদ্রূপের শান মধ্যে মধ্যেই ছিটকে বেরিয়ে আসছে ব্যবহারের মধ্যে।

বোনকে নিয়ে যখন চলে এসেছিলেন, তখন ছিলেন রংপুরে। সেখানে বাবা হাতুড়ে ডাক্তার। তবে উপার্জন মন্দ ছিলো না। যদ্দিন প্রথম স্ত্রী জীবিত ছিলেন, প্রতিপালন যোগ্য কিছু পরিজন ছিলো বাড়িতে। যেমন বিধবা পিসি, নাবালক তিনটি ভাইবোন ও একজন বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই। দ্বিতীয় স্ত্রী এসে ছ'মাসের মধ্যেই সকলকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা দু'ভাইবোনই ছিলেন শেষ পর্যন্ত। তিনি বড়ো, ললিতা ছোটো। তখন তাঁর বয়েস ছিলো দশ, ললিতার তিন। যখন তাঁর বারো হলো, তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই সুবল জন্মালো, কুড়ি বছরে পৌঁছতে পৌঁছতে সুবলের পরে ধবল, ধবলের পরে পুঁটু। বাড়িতে তিনি ভৃত্য নিযুক্ত হলেন, ললিতা দাসী।

অনেক আগেই পালাতেন। বোনের জন্য পারেননি। ওকে নিয়ে কোথায় যাবেন? তাছাড়া দুর্বল চরিত্র পিতার জন্য একটা মমতা ছিলো।

মনে হতো মানুষটাকে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। পথে ঘাটে বাজারে হঠাৎ হঠাৎ যদি কখনো তাঁর দেখা হয়ে যেতো বাবার সঙ্গে, অর্থাৎ যেখানে বিমাতার অবস্থান বহু দূরে, তিনি করুণ চোখে তাকাতেন, নরম গলায় 'খোকা' বলে ডেকে হাত রাখতেন পিঠে। বিমলেন্দু সেই হাত নামিয়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন। তারপর মাঠে গিয়ে রাত পর্যন্ত বসে থাকতেন চুপচাপ। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করতো না। তবু ফিরতে হতো। হতোই।

টিউশনি করতেন উদয়াস্ত। জেদ করেছিলেন, পড়াশুনোয় পয়লা নম্বর হবেন। তখনো বুঝে উঠতে পারেননি, বিদ্যাই ভূষণ নয়, আসল ভূষণ অর্থ। রাত জেগে পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিলেন। আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন, বি এ-টাও সেই রকমই একটা হবে বলে আশা করেছিলেন, হলো না। তেরো বছরের ললিতার পিঠে পাখার বাঁটের দাগ কেটে বসে গিয়েছিলো। পুঁটু কামড়ে দিয়েছিলো হাতে, ছাড়াতে না পেরে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একটা চড় মেরেছিলো গালে। বিমাতা দাওয়ায় বসে পাখা দিয়ে হাওয়াও খাচ্ছিলেন, বাঁট দিয়ে ঘামাচিও চুলকোচ্ছিলেন, এই সময়েই এই কাণ্ড। পিটিয়েছিলেন প্রায় পনেরো মিনিট ধরে, তাতেও তাঁর গায়ের ঝাল মিটছিলো না। সেই ছোট্ট পুঁটুই জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলেছিলো, 'আল্ মালেনা, আল্ মালেনা, আমান্ দিদিকে আল্ মালেনা।'

পরের দিন ফাঁক বুঝে গয়না চুরি করে ললিতাকে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে স্টেশনে এসে সোজা কলকাতা। শেয়ালদর কাছেই একটা হোটেলে কদিন কাটিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন বোনকে। হস্টেলে রাখলেন। নিজে একটা সস্তা মেসে আস্তানা নিয়ে চাকরি খুঁজতে লাগলেন।

•

কোথায় চাকরি? তখন চাকরি ছিলো নাকি দেশে? তবে কোন কাজকেই তিনি নিজের অযোগ্য বলে ভাবতেন না। সেটা কুলিগিরিই

হোক বা কেরানীগিরিই হোক। অবশ্য সেই ভাবনায় পৌঁছতে সময় লেগেছিলো। প্রয়োজন হলে একজন তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলে, তথাকথিত শিক্ষিত হয়েও যে কুলিগিরি করলে তার কলঙ্ক দেহে দাগ হয়ে লেগে থাকে না, সেটা বুঝে উঠতে অনেকগুলো দিন নষ্ট হয়েছে।

গয়না ভাঙিয়ে বেশীদিন চলেনি। বোনের কাপড়-জামা জিনিসপত্র ইস্কুলের মাইনে আজ এটা কাল সেটা এই সব চাহিদার পূরণ করা খরচ কম নয়। তার উপরে নিজেকে বহন করাও তো আছে? সেও কি কম নাকি? সিট রেণ্ট আছে, জলখাওয়া আছে, ভাত খাওয়া আছে, পথচলার দণ্ড আছে—আর এসেছিলেন তো এক কাপড়ে। আরেক প্রস্থও কিনতে হলো বৈকি।

তবে বছর খানেকের মধ্যেই তাঁর এই বোধ জন্মালো, ক্ষেতের চাষী, গৃহস্থের সেবক, পথের ফেরিওলা, ইস্টিশনের কুলি যে যে কর্মই করুক না কেন, কেউ অশ্রদ্ধার পাত্র নয়। তারা আশ্রিত নয়, তারা স্বাধীন। তারা কোনো দপ্তরের কোনো বেয়ারাকে কেয়ার করে না, যার জন্য বিমলেন্দু রায় লালায়িত হয়ে এর ওর দরজায় ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই বোধ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পেয়ে গেলেন যা তিনি চান।

আজ এইখানে উঠে আসতে তাঁকে যতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছে, প্রত্যেকটি সিঁড়ি ভিজে আছে তাঁর ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু আর চোখের জলে। না, পরিশ্রমের কোনো শেষ তিনি রাখেন নি। ফসলও পেয়েছেন।

॥ দুই ॥

এই হচ্ছেন বিমলেন্দু রায়। এই মুহূর্তে যিনি একটি সংস্থার ডিরেক্টর এবং একটি প্রেসের মালিক। প্রথম দর্শনেই সন্দীপনের সঙ্গে যাঁর একটা আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো।

নিমন্ত্রণের দিন আলাপ করিয়ে দিল সন্দীপন, 'আমার স্ত্রী দেবযানী মিত্র, খুব ভালো আঁকেন কিন্তু অপার্থিবের চেয়ে পার্থিব জগতের প্রতিই তাঁর টান বেশী।'

উঠে দাঁড়িয়ে আনত হয়ে বিমেলন্দু রায়, মৃদুহাস্যে অভিবাদন করলেন, বললেন, 'শুনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করছি। আমি তো এখানে একান্তই গরমিল, পার্থিব বস্তু ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।'

সন্দীপন উচ্ছসিত হয়ে বললো, 'বুঝলে মনি, এঁর সাহায্য সহায়তা এবং বুদ্ধিই একসঙ্গে এতোগুলো বই এতো সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে আমাকে মূলধন জুগিয়েছে। ইনি এ সব কাজ খুব ভালো বোঝেন। এবার আপনি নিজে প্রেস কিনলেন, আমার আর কোনো ভাবনা রইলো না।'

বিমলেন্দু রায় হাসলেন, 'না, প্রেস চালু করতে পারলে সত্যিই আপনাকে ভাবতে দেবোনা। তবে যা দেখছি, একান্তই ভাঙাচোরা ব্যাপার। বুঝতে পারছি না তুম করে কিনে ফেলে ভালো করলাম কিনা।'

খাবার পরিবেশন করতে করতে দেবযানী বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি খুব স্বল্পাহারী, আর একটা ফ্রাই দি?'

সনির্বন্ধ হলেন, 'আপনি দিতে চেয়েছেন, তবু 'না' বলার ঔদ্ধতা ক্ষমা করুন। আজ আমি মাত্রা ছাড়িয়েই আহার করেছি।'

'এই আপনার মাত্রা?'

হাসলেন, 'কোনো একজন ঔপন্যাসিক বলেছিলেন না, জিভ মানুষের ছোটোলোক, কথাটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সব বিষয়েই তো সেই গোত্রের মানুষ, চেষ্টা করছি এই একটা বিষয়ে অন্তত ভদ্রলোক থাকতে পারি কিনা। কিন্তু সত্যিই কি পারি? তবু যে আপনি আমাকে স্বল্পাহারী আখ্যা দিলেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ।'

এর পরে যিনি টাকা ধার দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো।

সন্দীপন যে বলেছিলো দশ হাজার টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে, সেই সম্ভাব্য দশ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র হাজার দুই তুলতেই সে গলদঘর্ম হয়েছে। এবং সেই সম্ভাব্যের আশায় ব্যাঙ্কের দু হাজার ন' শো আটাশি টাকা শুধু প্রস্তুতির খরচ হিসেবেই উড়িয়ে দিয়েছে কবে। এর পরে আর ধার ছাড়া গতি কি ?

সন্দীপনের ধার তো ? চুক্তিটা এই রকম ঃ ব্যবসা ফেল পড়লে ক্ষতি সব সন্দীপনের, লাভ হলে অর্ধেক ঋণদাতার।

তেল চুকচুকে ঘন চুল মাথা নিয়ে ভদ্রলোক মাংসের হাড় চুষে খাচ্ছিলেন। গায়ের রং চুলের মতোই কালো। চুলের মতোই তৈলাক্ত। সুখী সুখী মুখে বললেন, 'সন্দীপনবাবু তো আমাকে বাদই দিতে চেয়েছিলেন। আমি হলাম গিয়ে পার্টনার, আমাকে বাদ দেবেন কি মশাই। শুনতে পেয়েই চেপে ধরেছি। এসে তো দেখছি দপ্তরীটিও নিমন্ত্রিত।'

দেবযানী বললেন, 'না না, আপনাকে উনি বলতেন বৈকি, সময় পাচ্ছিলেন না। আমি তো প্রথম থেকেই জানি আপনি আসবেন।'

'তাই ?'

'নিশ্চয়ই। আর একটু ফ্রাইড রাইস নেবেন না ?'

'দিন, বলছেন যখন—'

নিতান্ত বিপন্ন হয়েই অন্য আর একজনের সূত্রে এই লোকটির কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হয়েছিলো সন্দীপন, কিন্তু 'ওঃ হি ইজ এ লোদসাম ক্রিচার' এছাড়া আর কিছুই সে উচ্চারণ করতো না তার সম্পর্কে। নিমন্ত্রণ বিষয়ে সত্যিই একে আসতে বলার কোনো ইচ্ছা ছিলো না। এবং এ-ও সত্যি নিমন্ত্রণটা ভদ্রলোক প্রায় যেচে এসেই নিয়েছেন।

আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সকলকেই দেবযানী চেনেন। সবাই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। ঐ একজন মানুষের জন্য আনন্দ উৎসবে কিছু

ভাঁটা পড়লো না। সবই সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে হলো।

বাজারে বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাও হলো খুব। এই ধরনের বিষয়েও যেমন আর কখনো কোনো বই দেখা যায় না এদেশে, এ রকম জমকালো প্রকাশকও অভিনব। প্রশংসা পেয়ে সন্দীপনের উৎসাহ আগ্রহ সবই দ্বিগুণিত হলো। স্বদেশী বিদেশী চিত্রকর মিলিয়ে আরো চারখানা বই তৈরী করে ফেললো দিবারাত্রি খেটে। বাড়িতে যেন রাজসূয় যজ্ঞ লেগে গেল।

যেমন সন্দীপনের নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই তেমনি তাঁরও নেই। এই কাজে সহায়তা করতে খুব ভালো লাগতো। কতো সব মূল্যবান তথ্য, কতো সব আশ্চর্য জীবন, তাঁদের কতো ত্যাগ, কতো তিতিক্ষা আর কতো দুঃখ দারিদ্র্যের ইতিহাস। ঋণদাতা পরামর্শ দিলেন, 'এ সব হাবিজাবি ছাড়ুন, ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাপুন, দেখবেন কেমন 'হট' কেকের মতো বিক্রি হয়ে যায়। রাতারাতি উঠে আসবে সব খরচ।' রক্তাক্ত চোখে তাকায় সন্দীপন, জবাব দেয় না।

কিন্তু সন্দীপন জবাব না দিলে কী হবে, জবাব আবার সেই ঋণদাতাই দিলেন। বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি ছিলো, মূল টাকাটা আপনি আমাকে ছ' মাসের মধ্যেই ফেরত দেবেন, তারপর যা লাভ-লোকসান পরে হিসেব হবে। সে জায়গায় ন' মাস কাটলো, আমি আর টাকা ফেলে রাখতে পারবো না।

শুধু তো সেই ভদ্রলোকের কাছেই ধার নয়, আরো অনেক দেনা জমে গিয়েছে তদ্দিনে। বলা যায় দেনার পাহাড়। বিমলেন্দু রায় আসেন মাঝে মাঝে, জিজ্ঞেস করেন, কেমন চলছে ব্যবসা। কেমন বিক্রী হচ্ছে বই। সন্দীপন হতাশভাবে মাথা নাড়ে হাত নাড়ে। দেবযানী চা করে আনেন, আগের মতোই যা পারেন কিছু না কিছু খাবার দেন সঙ্গে। সন্দীপনের মুখের হতাশা দেখে কষ্ট হয়। হাসিমুখে বলেন, 'এ সব বই কাটতে তো একটু সময় যাবেই, অত তাড়াতাড়ি হয় নাকি ?'

বিমলেন্দু বলেন, 'তাই তো। জয়ী হবার রাস্তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

আপনি জানেন, এক সময়ে হাবরাহাট থেকে সস্তায় গামছা কিনে, দশ পয়সা লাভে শিয়ালদতে এসে বিক্রী করেছি। এমন দিনও গেছে বাকির দায়ে মেস ছেড়ে ফুটপাতেও কাটাতে হয়েছে কদ্দিন। টিউসনি করতাম হুটো। সামান্য মাইনে, অসামান্য তাচ্ছিল্য, প্রতিজ্ঞা করে একদিন ছেড়ে দিলাম পড়ানো—আজকের কথা নয়, এখন সবই ধূ ধূ। কিন্তু ফিবে তাকালে সমস্তই স্পষ্ট। এ সব কথা থাক, এখন বলুন, এব পরে আর কোন বই বার করতে চান।'

'শুনবেন? আমি এবার কী ভেবেছি জানেন—' সন্দীপন আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, মাথার মধ্যে যে সব ভাবনা চিন্তা রাতদিন বিজবিজ করে মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে উজাড় করে দেয় সে সব।

আবহাওয়া হালকা হয়ে আসে, অনেক পরে যখন উঠে যান ভদ্রলোক, সব গ্লানি মুছে দিয়ে যান সন্দীপনেব মন থেকে।

দিলেও আবার জমতে কতোক্ষণ? অত কঠিন বই, অত মূল্যবান বই এবং সর্বোপরি চিত্রকলার ঐতিহাসিক পুস্তক একখানাও বিক্রী হয় না বাজারে, কেবল বাড়িতে পাহাড় জমে। যুদ্ধেব দয়ায় কতো লোক কতো ভাবে কতো টাকা করে ফেললো, ডুবে গেল সন্দীপন। আর সেই ডুবন্ত মানুষকে ভাসিয়ে রাখাব চেষ্টায় স্বাস্থ্যহীনতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে একদিন শয্যা নিলেন দেবযানী।

সেই অসুখের চিকিৎসা কী? ডাক্তাব বললেন, 'পরিপূর্ণ বিশ্রাম, পরিপূর্ণ আহার এবং নিশ্ছিদ্র চিন্তাহীনতা, বুঝতে পেরেছেন?' প্রেশার মাপা যন্ত্র নামালেন ডাক্তার। মৃদু হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে দেবযানী বললেন, 'কদ্দিনে সারবে?'

'সকালে কী খান?'

'সকালে? আমার সকালে খাওয়ার অভ্যাস নেই।'

'অভ্যাস নেই মানে?'

'এক কাপ কি দু কাপ চা খাই।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ।'

'এই সৎ অভ্যাসটি কদ্দিন থেকে চলছে?'

এ কথার জবাব দিলেন না তিনি। বলতে পারলেন না, শাশুড়ির উপর রাগ করে এবং শাশুড়ির খরদৃষ্টির তলায় কোনো খাদ্য গ্রহণের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে না পারার লজ্জায় বলা যায় প্রায় বিবাহের পর থেকেই তিনি এই ক্ষুধাকে জয় করে ফেলেছেন।

চুপ করে থাকতে দেখে ডাক্তার সন্দীপনের দিকে তাকালেন, 'আপনি বকতে পারেন না? দেখুন, সকালের খাওয়াকে ওরা বলে ব্রেকফাস্ট, এর একটা বৈজ্ঞানিক অর্থ নিশ্চয়ই আছে?'

সন্দীপন অবাক হয়ে দেবযানীর দিকে তাকালো, 'সে কী, তুমি সকালে কিছু খাওনা?'

দেবযানী চুপ।

'কী অন্যায়। খুব অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমাকে তো বলেনি। আপনি একে খিদের ওষুধ দিন।'

ডাক্তার বললেন, 'খিদের ওষুধ নয়, খাওয়াটাই এখন এঁর মুখ্য চিকিৎসা। আমি তালিকা করে দেব। সেটা যে করে হোক আপনাকে খাওয়াতেই হবে।, প্রেশার যতোটা নিচে, তাকে ওঠাতে হলে শুধু খাওয়াই নয়, গ্লুকোস ইনজেকসনও নিতে হবে ভেইনে। সেটা কষ্টকর হবে একটু।' উঠলেন, হাসলেন দেবযানীর দিকে তাকিয়ে, অভয় দিলেন, 'কিছু ভয় নেই, শীগগিরই ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু যা যা লিখে দেব, খেতে হবে সে সব।'

এর কিছুদিনের মধ্যেই দেবযানী বুঝতে পারলেন তিনি সন্তানসম্ভবা। সন্দীপনের এই দুঃসময়ে কোন শত্রু তার গর্ভে এলো? নয়, ছয়, চারের তিনটি শিশু, একজন চলৎশক্তিহীন গুরুজন, আর একজন শিশুদেরই মতো নির্ভরশীল একটি স্বামী নিয়ে এতোকাল সংসারের যে তরণীটির হাল তিনি একা হাতে ধরে তীরে এনে বেঁধে একটু বিশ্রাম পেয়েছিলেন, এখন এমন ঝড়ের মুখে কোথায় তাকে তলিয়ে দেবেন?

ব্যাকুল সন্দীপন স্ত্রীর দু-হাত নিজের বুকে ধরে রেখে মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে বলে, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না মনি, কিচ্ছু ভেবো না, শুধু ভালো হয়ে ওঠো।' বলতে বলতে তার গলা ধবে আসে।

রমেশের মাও ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ায়। 'বউদি, তুমি কিছু ভেবো না, আমি সব চালিয়ে নেবো। তুমি এতো বছর আমাদের এতো করেছো, আর আমরা তোমাকে করবো না? ভালোই হলো, একটু বিশ্রাম হবে তোমার, খাওয়া দাওয়া হবে। আমার কথা তো শোনো না, সব সময়ে নিজেকে অযত্ন করে এই রোগ তো বাঁধালে শেষে?

নবনিযুক্ত সনাতনও এলো, 'বউদি, আমরা আছি, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ডাক্তারবাবু যা বলেন সব পালন কববেন।'

॥ তিন ॥

সত্যিই তারা ছিলো। শেষ পর্যন্ত ছিলো। তাদের থাকা যে কতো মূল্যবান ছিলো, তার কি কোনো তুলনা আছে? সেবায় শুশ্রূষায় ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় তারা কি না করেছে দেবযানীকে? প্রকৃতির নিয়মে রমেশের মা মারা গেল একদিন, বদলে একটি বালক এলো ফুটফরমাস খাটার জন্য। সেই বালক এখনো আছে, এখন সে মধ্যবয়সী। সনাতন বছর সাতেকের মধ্যে অন্য একটা বেশী মাইনের কাজ পেয়ে চলে গেল চোখের জল মুছতে মুছতে। রমেশের মার মতোই আর একজন মহিলাকে খুঁজে পেতে বহাল করলেন দেবযানী। ভাগ্য তাঁর ভালো, সব সময়েই কপালে ভালো লোক জোটে।

তবে তিনি যে ভাগ্যবতী এতো আবাল্যই শুনে এসেছেন। অসচ্ছল পিতার গৃহে জন্মে সচ্ছলতায় ভেসেছেন। লেখাপড়া শিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, যোগ্যতার অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়েছেন, মা বাবাকে একদিনো না ভাবিয়ে চেষ্টা এবং অর্থের দায়ে একদিনো বিচলিত না করে চমৎকার স্বামী পেয়েছেন, সুন্দর সুস্থ সবল তিনটি সন্তান পেয়েছেন, সবই তো

ভাগ্যের দয়া।

কিন্তু কেউ না জানুক দেবযানী জানেন ভাগ্যের সঙ্গে দুর্ভাগ্যের ছায়াও সর্বদা অনুসরণ করেছে তাকে। তা নৈলে হেমলতা অকারণে অত বৈরী হবেন কেন? প্রথম জীবনের কতো সুখ তাঁর জ্বলে গেছে শাশুড়ির ঈর্ষানলে। প্রথম প্রণয়ের প্রত্যেকটি ঢেউকেই আহত করে করে হৃদয়ের সব কম্পন তিনি ব্যাহত করেছেন। এখন কি আর সে সব দিন ফিরে পাবেন?

তা হোক, তবুও তাঁদের ভালোবাসা অমলিন ছিলো, অক্ষুণ্ণ ছিলো, অখণ্ড ছিলো। যুদ্ধ করে করে দেবযানী এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে ব্যক্তিত্বে কর্তৃত্বে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর আসন তাঁর অটুট। কয়েকটা বছর সত্যি কোনো অশান্তির সঙ্গে দেখা হয়নি। শাশুড়ির মলমূত্র পরিষ্কার করতে কোনো দ্বিধা ছিলো না মনে, সংসারের অনুকেটি চৌষট্টি সম্পাদন করতে হয় বলে কোনো ক্ষোভ ছিলো না মনে। তিনটি শিশুর সঙ্গে তাদের বাবারও নানান খেয়াল খুশি চরিতার্থ করতে হয় বলে কোনো আলস্য ছিলো না মনে। আর ঋণ? না। নিজে যতোদিন যাবত সংসারের সকল দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন মাথায়, এক পয়সা ঋণ করেননি। অথচ এতোদিন বাদে সেই ঋণেই সন্দীপন এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর এই সময়েই কিনা তাঁকে শয্যা নিতে হলো? আর এই সময়েই কিনা—

চোখের জলে সন্দীপনের পাঞ্জাবীর বুকও যেমন ভিজিয়েছেন মাথার বালিশও তেমনি ভিজিয়েছেন। কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন কী করে এই পারাবার অতিক্রম করবেন সেটাই চেষ্টা করা দরকার। রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন খারাপ করে আর কী লাভ? কিন্তু হাজার মনের জোর খাটিয়েও ছমাসের আগে এ শয্যা তিনি ত্যাগ করতে পারলেন না। আর যখন উঠতে পারলেন, দেখলেন সংসারের চাকা তাঁর জন্য এক মুহূর্তও থেমে থাকেনি। সে চাকা তাঁর ক্লান্তির নির্যাসে সচল নয়, যথেষ্ট তেলের প্রলেপে মসৃণ। ধার দেনার দায় থেকে নিস্তার

পেয়ে সন্দীপনও নিশ্চিন্ত। স্ত্রীকে উঠতে দেখে তো মহাখুশি। আবার সে রং তুলিতে বিকিয়ে দিল নিজেকে। আবার সে তার নিজস্ব জগতে ফিরে গেল।

এখন তার এক স্ত্রী নয়, দুই স্ত্রী। বন্ধুকে সে চোখে হারায়। এক-বেলা না এলে অস্থির হয়ে ওঠে। সন্দীপনের প্রতি আকর্ষণ বিমলেন্দু রায়েরও কিছুটা অস্বাভাবিক। তাকে নিরুদ্বেগ রাখতে সুখে রাখতে শান্তিতে রাখতে সব সময়েই সমান উৎসুক। সন্দীপনের প্রাচুর্য এখন প্রয়োজনের তুলনায় অপরিমিত। দরজি আসছে বাড়িতে, মেয়েদের পোশাক তৈরী হচ্ছে, ইস্কুলেব ড্রেস তৈরী হচ্ছে, এক জোড়া জুতো ক্ষয় হতে না হতেই আর এক জোড়া আসছে। তাই পিতাও যেমন সুখী তার সন্তানেরাও তেমনি বি. আব. বলতে পাগল। বি. আর. অর্থাৎ বিমলেন্দু রায়। এই ডাকটা তাদেব কে শিখিয়েছিলেন দেবযানী জানেন না।

এই কিছুদিন আগেও যিনি অপরিচিত ছিলেন, এখনো যিনি অন্তত দেবযানীর কাছে প্রায় অর্ধপরিচিত তিনি যে এ সংসারে এরকম একজন অতি আপন এবং কর্ণধাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মাত্রই এই ছ'মাসের ব্যবধানে তা দেখে দেবযানীব বিস্ময় আর কাটে না। সন্দীপন তার কাছ থেকে সাহায্য নিতে যতো নিঃসংকোচই হোক না কেন দেবযানীব ভীষণ খারাপ লাগে, দ্বিধা হয়, অনভ্যস্ত হৃদয় সংকুচিত হয়। সন্দীপন হাসে, বলে, 'শুনছেন বিমলেন্দু, দেবযানী কি বলছে?'

'কী?'

'আপনি যে আমাদের জন্য এতো করেন, এতো ভাবেন, সেটা ওর ভাল লাগে না। অন্যায় মনে হয়। আমাকে বলে, তুমি বড় স্বার্থপর।'

বিমলেন্দু রায় আয়াস করে বসেন, মামনিদের আদর করতে করতে বলেন, 'দাতার সঙ্গে গ্রহীতার সম্পর্ক সত্য হলে তবেই যে দাতার দান উজ্জ্বল হয়ে ওঠার অবকাশ পায় তা উনি জানেন না।' দেবযানীর দিকে তাকান, 'একটু ভুল করেছেন, স্বার্থপর সন্দীপন নয়, আমি। আমি

আপন স্বার্থ সিদ্ধি করতেই এ পরিবারকে অভিন্ন রাখতে চাই।'

মেয়েরা তিনজনই বিমলেন্দু রায়ের মামনি। বড়োমামনি, মেজ-মামনি, টুনটুন মামনি। মামনিরা তাদের আদরের বি. আর-কে ঘিরে থাকে, চুমু খায়, ছাড়তে চায় না। পুরো ছ'মাস তারা মায়ের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এই স্নেহের প্রশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করেছে। কী আর বলবেন দেবযানী? তাঁর সন্তানদের কেউ ভালোবাসছে এর চেয়ে ভালো লাগার বিষয় আর কী আছে তাঁর? মামাবাড়ি সেই সুদূর দিল্লীতে, পিত্রালয়ে যিনি আদর আবদারের একমাত্র মানুষ ওদের ঠাকুমা তিনি শুধু পীড়িত বা পঙ্গুই নন, উদভ্রান্তও। নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছেন। একমাত্র পুত্রবধূকে ছাড়া জগতের আর সকলকেই শত্রু ভাবেন। একমাত্র ভোজ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুর উপরই কোনো আকর্ষণ নেই। তারই মধ্যে কখনো কখনো বড় নাতনীটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘোলাটে চোখ টলটলে হয়ে ওঠে, ভেজা ভেজা গলায় ডাকেন, 'আয়, কাছে আয়।'

সুতরাং আদরের জন ওদের কোথায়? এরকম একজন মানুষকে ভালো ওরা বাসবেই। তবু দেবযানীর মন কোথায় খুঁত খুঁত করে কে জানে। যা সন্দীপনের করণীয় তা দেবযানী করতে পারেন বটে, কিন্তু একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে তার বিকল্প ভাবা কঠিন মনে হয় তাঁর পক্ষে।

এই মানসিকতার মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হলো নীলেন্দু। সকলের আদরের ছোট্ট নীল। রুগ্ন মায়ের গর্ভ থেকে নীল হয়েই পৃথিবীর আলোতে এসে পৌঁছেছিলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদেনি, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে স্বাভাবিক রং ফিরে আসেনি।

এইখানটায় এসে আজকের এই গভীর রাত্রে এই মুহূর্তে দেবযানীর ভাবনা থামলো। হঠাৎ গালগলা ব্যথা করে দুঃসহ কান্নায় ভরে গেল বুক। মনে পড়ে গেল সেই নীলকে। তিনি কি যত্নে মানুষ করেছিলেন। সব সন্তানের প্রতিই তাঁর যত্নের কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। যেহেতু

তাদের পিতার বাৎসল্য নামক বস্তুটা প্রায় উল্লেখযোগ্য রকমের কম এবং সন্তানদের নিয়ে আদর আবদার করাটা তার কাছে মেয়েলি আদিখ্যেতার নামান্তর মাত্র। হয়তো সেজন্যই এই মাত্রাধিক্য ঘটে থাকবে। তাছাড়া ঘরে বাইরে সব রকম দায়িত্ব পালন করতে করতেও হয়তো এটা হয়েছে। অথবা সব শিশুদের প্রতিই তাঁর স্বভাবত একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে বলেই শিশু নিয়ে এই বাড়াবাড়ি। সন্তানদের তিনি আক্ষরিক অর্থেই বুকে করে বড়ো করেছেন। তাঁদের কোনো আবদারে কখনো তিনি বিরক্ত বোধ করেননি, অন্যায় করলে ধমক দিয়েছেন কিন্তু ভুল ক্রমেও আঘাত করেননি শরীরে। মিষ্টি কথায় ভালোমন্দ বোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন, সহবৎ শিখিয়েছেন, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এখানেও ভাগ্য। তাঁর চারটি শিশুই আদর্শ শিশু ছিলো। শান্ত ভদ্র বাধ্য এবং মেধাবী। মা-অন্ত প্রাণ। মাকে তারা মোহের মতো ভালবাসতো। বাবার প্রতি তখন হয়তো ভালোবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাবল্যই বেশী ছিলো। তারা জানতো তাদের বাবা আর পাঁচ-জন বাবার মতো সাধারণ নয়, সাধারণ বাবাদের মতো চাল ডাল তেল নুন নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁকে মানায়না, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সুদূর। তিনি ঈশ্বর। এখন ভাবলে অবাক লাগে, যে ধ্যান ধারণার বীজ তাদের অপরিণত উর্বর মস্তিষ্কে একদিন তিনিই বপন করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাই নিয়েই কতো অভিযোগ করেছেন। ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছেন, বাবা যা-ই করেন তাই আদর্শ। এটা বাবা পারেন না, বাবার কাজ নয়, এটা বাবাকে মানায় না—আর মা? মাকে সব মানায় না? মা সারাজীবন সকলের দাসীবৃত্তি করুক এটাই তাঁর ধর্মকর্ম কাম মোক্ষ না? বলতে বলতে কান্না এসে গেছে। মানুষের মনের কারখানা যে কতো বিচিত্র অনুভূতি দিয়েই ঠাসা তার ঠিক নেই। ভারি বয়সে পৌঁছে এতোকাল বাদে, এতো কিছুর পরে স্বামী এবং সন্তানদের কাছ থেকে কেবল মাত্র ভালোবাসা আর কর্তব্যই নয়, আরো কী যেন আশা করেছেন তিনি। কী? তার স্পষ্ট চেহারা জানেন না, শুধু জানেন যে ত্যাগ আর তিতিক্ষা

দিয়ে এই সংসারটাকে তিনি একা হাতে রক্ষা করেছেন সেই সংসার তাঁকে সামান্য একটু স্বীকৃতি দিতেও যেন কৃপণ। সকলকে বড়ো অকৃতজ্ঞ মনে হয়েছে।

কিন্তু যখন যা করেছেন বা করছেন কখনো কি কোনো প্রতিদানের আশা ছিলো মনের মধ্যে? প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁরই স্বামী, তাঁরই সন্তান —আব হেমলতা? হেমলতাও তো তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কে ছিলো হেমলতার? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কাকে চিনতেন? যেদিন মারা গেলেন সন্দীপন কলকাতা ছিলোনা। একটা কনফারেন্সে বম্বে গিয়েছিলো। লোকজন ডেকে দেবযানীই নিয়ে গেলেন শ্মশানে, মুখাগ্নি করলেন, কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। শাশুড়ির মৃত্যুতে তিনি কিছুটা নিষ্কৃতি নিশ্চয়ই পেয়েছেন কিন্তু কষ্টও কি কম পেয়েছেন?

নীল জন্মাবাব পরেও কিছুকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তারী মতে তখনো তাঁর বিশ্রামের নির্দেশ বলবৎ। ওঠা হাঁটার কাজ একেবারে বারণ। বিছানায় থেকে যতোটুকু। সেইখানে বসে বসেই মেয়েদের লেখান পড়ান, তেল মাখান, স্নানে পাঠান, মাথা আঁচড়ে দেন, খাইয়ে দেন, তারা ইস্কুলে যায়। সন্দীপনও যতোক্ষণ আপিসে না যায়, ওটা কই সেটা কই করে, তাঁর খাটের পাশে বসে দাড়ি কামায়। নবজাত শিশুকে আদর করে বলে, 'কীরে, বাঁদরই যে আমাদের পূর্বপুরুষ, তোকে দেখলে তো আর সে কথা অবিশ্বাস করা যায় না।'

এ কথায় ভীষণ আহত হন দেবযানী। রাগ করেন। পরম স্নেহে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চুমু খান। সন্দীপন তখুনি হেসে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখেন, 'না, না, তোমার ছেলে খুব সুন্দর। সত্যি বলছি। খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগে ওর মুখটা। কেমন বড়ো বড়ো চোখ।' গাল টিপে দেয় ছেলের, 'একটু মোটা হবি কবে? তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যা, তোকে আর ওরকম মা ঘেঁষা হতে দেবোনা দিদিদের মতো। তুই

একদম আমার মতো হবি।'

অবশ্য সেই কথা সে রক্ষাও করেছিলো। ছেলের প্রতি তার আদর যত্ন তার পক্ষে বেশ উগ্র ছিলো। তিনমাসেই সেই ছেলেকে তেল মালিশ করে করে দেবযানী এমন ওজন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে সুস্থ শিশুর নমুনা হিসেবে একটি ছবি পর্যন্ত বেরিয়ে গেল কাগজে। মাথাভর্তি ঢেউ ঢেউ চুল, শ্যামলা রং লাবণ্যে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরপুর নীলকে দেখে তখন আর কে বলবে সে এই সেদিনও এতো রোগা ছিলো যে তার বাবা তাকে মানবজাতির পূর্বপুরুষ বলে ঠাট্টা করেছিলো।

ঠিক তখনই আবার ছবি আঁকতে শুরু করেন তিনি। মেয়েরা স্কুলে গেলে, সন্দীপন আপিসে গেলে, পেট ভর্তি করে খেয়ে নীল ঘুমিয়ে পড়লে দেবযানীর কী কাজ ? গ্রীষ্মের লম্বা লম্বা দুপুর শুধু ছবি এঁকে কাটে।

সেই সব দিনে কোনো কিছুর জন্যই কোনো দায়িত্ব ছিলো না তাঁর জীবনে। বাড়িতে আরো একটি পরিচারিকা আমদানি করেছিলেন বিমলেন্দু রায়, সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁকে আর তাঁর নবজাত শিশুকে সেবা করবার জন্য। অখণ্ড অবসর। অথচ কিছুদিন আগেও সময় নামক জিনিসটি কেবলি হাত পিছলে কেমন করে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেছে বুঝতেও পারেননি। সব সময়েই হাঁসফাঁস। এই বিশ্রাম বসন্তের প্রলেপ। এই বিশ্রাম এই নির্ভার জীবনের স্বাদ সুখকর। সব ভাবনা চিন্তার বোঝা এখন বিমলেন্দু রায়ের মাথায় চাপানো আছে। আর তা নিয়ে আগের মতো তাঁর বিবেক পীড়িত হয় না, সংকোচও হয় না। ভদ্রলোক খুব সুন্দর ভাবে সূক্ষ্মভাবে নিঃশব্দে তাঁর মনের পালেও হাওয়া দিয়ে নৌকো ঘুরিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে। বছরও তো ঘুরে গেল।

এতোদিন নীলের দিদিদের নিয়েই আদর আবদার বেড়ানো খেলানো দরকার মতো ইস্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, অসুখ-বিসুখে সেবা করা ডাক্তার ডাকা ওষুধ আনা, চিন্তিত হওয়া—এসব ছিলো, এখন নীলও

কোলে উঠে বসলো।

একদিন দেবযানী ঠাট্টা করলেন, 'আসুন, আপনাকে একটা বিয়ে দিয়ে সংসার পেতে দি। এমন একজন চমৎকার পাত্রকে কি বৃথা বয়ে যেতে দেয়া যায়?'

বিমলেন্দু রায় চোখ চেয়ে হেসে চুপ করে থেকে বললেন, 'কার সার্থকতা কীভাবে আসে তা কি আপনি জানেন? যা পাবার তা আমি পেয়ে গেছি। আপনি ভালো হয়ে উঠুন।'

বলার ধরনে এমন কিছু ছিলো যার প্রত্যুত্তরে দেবযানী কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তবে অচিরেই ভালো হয়ে উঠলেন। বিকেলবেলাকার মৃদু জ্বর ছেড়ে গেল তাঁকে, রক্তের নিম্নচাপ স্বস্থানে উঠে এলো, দুর্বলতা অন্তর্হিত হলো, ওজনেও বাড়লেন খানিকটা। তারপর আগের মতোই চলাফেরা কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। এখন তাঁর সংসারে সাহায্যকারী তিনজন। নীলের জন্য মানদা, সন্দীপনের জন্য কানাই, রান্নার জন্য সনাতন। মানদা শুধুমাত্র নীলই নয়, তিনি ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে তেল মাখিয়ে খাইয়ে যতোক্ষণে বিছানা থেকে নামেন, ততোক্ষণে সে একটা মস্ত বড়ো কর্ম সম্পাদন করে রাখে। হেমলতাকে প্রাতঃকৃত্য করিয়ে, ভেজা বিছানা বদলিয়ে, অয়েল ক্লথের উপর ধোয়া চাদর পেতে ডেটল দিয়ে ঘর মুছে একেবারে ফিটফাট। এতে যে দেবযানী কতো হালকা বোধ করেন তার ঠিক নেই। এ কাজটা তার পক্ষে বস্তুতই কঠিন ছিলো।

তবু কাজের অন্ত কী সংসারে? টুনটুন তো ছোটোই? সাড়ে চার বছরের মেয়ের অনেক চাহিদা আছে তার মায়ের কাছে। এতোদিন তো সে-ই কনিষ্ঠ ছিলো? মাকে সে চোখে হারায়। আঁচল ছাড়ে না। সেই আঁচলকে চিবিয়ে চিবিয়ে একেবারে যা তা করে রাখে। মা বাথরুমে গেলেও দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, 'মাতু, আমি একেনে থাকি-ই-ই-ই —'

দেবযানী বাথরুম থেকে মুখ ধুতে ধুতে জবাব দেন, 'কোনখানে সোনা?'

'এই দজরা ধরে ?' অনেকদিন পর্যন্ত সে দরজাকে দজরা বলতো। দেবযানী কিছুতেই শুধবে দিতেন না, অসম্ভব মিষ্টি লাগতো শুনতে।

বাথরুম থেকে হেসে তিনি আবার বলতেন, 'কোন দজরা বাবলান ?'

'বাথরুমের দজরা।'

'কেন ?'

'তুমি আচো।'

'কিছু চিবুচ্ছোনা তো ?'

অমনি একটা ঝটপট আওয়াজ হতো। বোঝা যেতো তাড়াতাড়ি চিবুতে থাকা জিনিসটা ফেলে দিচ্ছে।

জবাব আসতো, 'একোন্ তো চিবুবচি না।

'কখন চিবুচ্ছিলে ?'

'এট্টু পবে।' একটু পবেটাও দেবযানী শুধবে দিতেন না। একটু আগে কে সে একটু পবে বলতো।

সেই টুনটুন এখন কোথায় কতোদূবে ! সে ও চিত্রকলায় পাবদর্শিনী। প্যারিসই তার বাসস্থান। সেখানেই স্থায়ী, সেখানেই বাড়ি কিনে বাসিন্দা। স্বামী আগে লণ্ডনে বি বি সি-তে ছিলো, এখন ফোকলোরিয়ান, লোকসঙ্গীতের ডকুমেণ্টারিতে তার খ্যাতি। লণ্ডন প্যারিসেব সর্বত্র, স্ত্রীর স্বর্গভূমিতেই এখন তার কর্মস্থল। আসে। বছবে একবার আসে। দেখা হতেই গলা জড়িয়ে ধরে একঢাল কান্না। 'মাগো, আমার মাগো'— নিজের ছেলেমেয়ের সামনেই কোলে বসে আদর—যেন ঠিক সেই বাচ্চা বয়সের টুনটুনি পাখি।

সন্দীপন ওকে টুনটুনি পাখি বলতো। নাচছে গাইছে হাসছে, গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সারাদিন সে পাখি। যেদিন ভাই হলো মাকে ছেড়ে বাবার সঙ্গে একা শুতে কী কান্না।

আর তার আগে মিলু ! সেই বা কতোবড়ো। মিলু টুনটুন দুজনেই তো-মাকে সমানভাবে চায়। কতো রাত কতো জ্বালান জ্বালিয়েছে। কার

দিকে মুখ ঘুরিয়ে শোবে মা তা নিয়ে কী ঝগড়া। সেদিন মিলু গিয়ে শুলো তার দিদির কাছে।

ন বছরের দিদি একরাত্তিরেই মা। কী পাকা পাকা ব্যবহার। বোনেদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, সঙ্গে নিয়ে খাচ্ছে, জামা পরিয়ে দিচ্ছে, মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে। বিমলেন্দু রায় এসে দুহাতে জাপটে নেন বুকের মধ্যে, 'ওরে আমার বুড়ি মারে, কেবল ওদের দেখছিস, আমাকে দেখবি না? আমাকে চা দিবি না এক কাপ?'

একযোগে অন্য দু বোনও ছুটে গিয়ে গলা জড়ায়। তিনজনকেই সঙ্গে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসেন, কোথায় কোথায় খাইয়ে নিয়ে আসেন বাড়িতে। ভাই হবার উপলক্ষে সকলের নতুন জামা জুতো লাল টুকটুকে রিবন। আর ইস্কুলের কামাই। আর ভাইয়ের জন্যে? সে তো দোকান উজার করে আনা হয়েছে। বাচ্চারা যতো খুশি, ততোধিক খুশি সন্দীপন। 'মান, মনি, দ্যাখো, বিমলেন্দুর কাণ্ড দ্যাখো—ওরে বাবা নীলবাবুর জন্যেও এতো! আর তার বাবার?'

বাবার জন্যেও বেরোয়। বারোখানা রুমাল, এক টিন স্টেট এক্সপ্রেস। যা তোর সবচেয়ে প্রিয়।

দেবযানীর জন্যও আসে, আপেল আঙ্গুর বেদানা মনাক্কা লেবু—ফলের পাহাড়। আর এক শিশি আতর।

সন্দীপনের আনন্দ অনাবিল। যাকে সে ভালোবাসে সে তো তার। তার উপহারে কোথায় গ্লানি? কোথায় কুণ্ঠা? এটার মূল্য তো টাকা নয়, এর মূল্য সব সংস্কারের উর্ধ্বে। সন্দীপন অন্য জগতের মানুষ, তার কথা আলাদা। কিন্তু দেবযানী তো একান্তই এই পৃথিবীর? তিনি খুশি হন তবু কোথায় একটা কাঁটাও বিঁধে থাকে। এমনভাবে নিতে ইচ্ছে করে না অন্যের কাছ থেকে। ভালোবাসা নেওয়া সহজ, ভালোবাসার আকৃতি তাঁকে কুণ্ঠিত করে। তিনি জানেন নিতে হলে দিতে হয়, কী দেবেন? দেবার যোগ্যতাই বা তাঁদের কোথায়?

সন্দীপন নিশ্চিন্ত আছে, তিনি নন। বিমলেন্দু তাদের মোটা ধারটা

শোধ করেছেন বটে, চারপাশে তো আরো কতো আছে? সেগুলো তো শোধ করতে হবে নিজেদেরই? আর বিমলেন্দু রায়ের ধারটাও কি ধার নয়? তাও কি শোধ করতে হবে না কখনো?

সন্দীপন বলে, 'কী পাগলের মতো বলছো? বিমলেন্দু আমার কতো আপন তা তুমি জানো? বিমলেন্দুকে আমি কখনো বলতে পারি এই নিন আপনার ধার শোধ। ওর ধার কি শোধ হবার? বিমলেন্দু কি তারপরেও আমাদের মুখ দেখবে?'

হয়তো সত্য কথা। বিমলেন্দু রায় যেভাবে করেন তাতে তাঁকে ঐ টাকা ক'টা ফেরৎ দেয়া বাতুলতা মাত্র। যা করেন তার জন্য কখনো তো অনুমতির ধার ধারেন না, ইচ্ছেমতো চলেন, বলেন করেন। যেন ওরই সংসার। সন্দীপন নির্বিকার। বেঁচে গেছে সব ঝামেলা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে। এই যে জিজ্ঞাসা নেই বাদ নেই ঘট করে কোন হাসপাতাল থেকে মানদা আযাকে নিয়ে এলেন, কতো দেন উনি তাকে, আন্দাজও করতে পারেন না দেবযানী। মানদাও বলে না। জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে জানায়, 'সেব আমার লোক সঙ্গে কথা।'

তারপর এই যে দেবযানী প্রায় গোটা বছরটাই ভুগলেন, রাজসিক-ভাবে চিকিৎসা হলো, পথ্য হলো, একটি চিজ না খেয়েও জীবনযাত্রা অব্যাহত রইলো, নাতের জন্ম হলো, এইসব অন্তহীন খরচের হিসেব কে করবে? সেটা শোধ হবে কী দিয়ে? কোন জন্মে?

॥ চার ॥

সবই সত্যি তবু অনেক সময়েই তিনি এ নিয়ে ভাবেন। তিনজন সাহায্যকারী থাকলেও চারজন বাচ্চা নিয়ে কাজ ফুরোতে চায় না। তিনজনের মধ্যে কানাই নামক কিশোরটি তার বাবুর ছায়া। সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এই তাঁর জুতো সাফ করে দিচ্ছে, এই দৌড়ে গিয়ে দেশলাই সিগারেট কিনে আনছে আবার ছুটে যাচ্ছে পাঞ্জাবী ইস্তিরি করতে

নিচের লণ্ড্রিতে, রুমাল খুঁজে দিচ্ছে, তোয়ালে এনে দিচ্ছে, দাড়ি কামাবার গরম জল আনছে—কানাইকে পাওয়া যাবেনা সন্দীপন আপিসে না যাওয়া পর্যন্ত। সনাতনকেই বা কে ছোঁবে? দৌড়ে বাজারে গেল, এসেই আর তাকালো না কোনো দিকে। খাবার লোক তো এখন অনেক। ওদিকে হেমন্তও ভাতের গন্ধে অস্থির। 'ও মনি আমাকেও দুটি দিয়ে দাও না। ও মনি—'

আর মানদা? সে তো বাচ্চা আর বাচ্চার কাঁথা কাপড় দুধের বোতল খাবার সাজসরঞ্জাম সামলাতেই ব্যস্ত। সকালবেলা নলবাবু কম কাণ্ড করে রাখেন না।

কাজেই চারদিকেই ছুটতে হয় দেবযানীকে। রান্নাঘরে গিয়েও সাহায্য করতে হয়, টিনটিনকে মিলুকেও স্নান করিয়ে খাইয়ে তৈরী করিয়ে দিতে হয়, তাদের স্যুটকেসের খাতাপত্র বই দেখে গুছিয়ে দিতে হয়, সেই সঙ্গে তার বাবার মুহুর্মুহু ডাক, তারি মধ্যে এসে যায় কেউ, চা দাও। বিমলেন্দুবাবু আসেন, থাকেন তো একা একটা ফ্ল্যাটে। তাঁকেও নানা ধরনের খাবার তৈরী করে সাধেন, কখনো খান কখনো খান না। এরমধ্যে বুলুটাই স্বনির্ভর। নিজেরটা তো নিজে করেই, মাকে গলদঘর্ম হতে দেখে আবার মাকেও সাহায্য করতে চায়। মাত্রই তো ন বছর বয়েস, কী লক্ষ্মী, কী কাজের।

বিমলেন্দু রায় বলেন, 'এই বুড়িটাকে আমি একদিন নিয়ে পালাবো।'

তারপর সব একযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাড়িও যেমন ফাঁকা তেমনি লণ্ডভণ্ড। এবার কানাই ছোটে কাপড় কাচতে, সনাতন সকরি বাসন তুলে মেজে বাকী রান্না সারে, মানদা নালোর স্নানের জোগাড় করে, দেবযানী ঘরগুছোতে বসেন।

কানাই চ্যাঁচায়, 'মা তুমি কিন্তু ঘর ঝাঁট দিওনা! আমি দেব।'

দেবযানী বলেন, 'কাপড় পড়েছে কতো দেখেছিস? ঐ কাচতেই তো তোর বারোটা বাজবে, ততোক্ষণে আমি এদিকটা সেরে ফেলি।'

তিন মেয়েই এক ইস্কুলে যায় না। মিলু বুলু উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী, টুনটুন যায় পাড়ার নার্সারি মিসেস খাস্তগীরের স্কুলে। সেখানে ছড়াটড়া শেখে, খায় ঘুমোয় দুষ্টুমি করে, বাড়ি ফিরে আসে আড়াইটার মধ্যে। পাঁচ বছরের আগে তখন বাচ্চাদের মাথায় এমন পড়ার চাপ ছিলোনা, সেটা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতো। বুলু মিলুকে পাঁচ বছরেই হাতে খড়ি দিয়ে ছ বছরে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। এতো শরীর খাবাপ হয়ে যাওয়ায় টুনটুনিকেই তাড়াতাড়ি স্কুলে দিতে হলো। অবশ্য মিসেস খাস্তগীরের এই ধরনের একটা ইস্কুল পাড়াব মধ্যে হলো বলেই দিতে পারলেন, দূবে হলে পাবতেন না।

বিমলেন্দু রায় আগে সন্ধ্যেবেলা আসতেন, এখন সকালবেলাও আসেন একবার। নীলকে দেখে যান। ন'লের প্রতিও তাঁর বেশ টান হয়েছে। বলেন, 'এই তো সুন্দর মানুষেব মতো হয়ে উঠেছে। বাব্বা, কী ভারি হয়েছে ওজনে।' কোলে নেন, 'তুই ছ মাসেই দেখছি একেবারে গোবর গামা, দাঁড়া একটু বড়ো হলেই কুস্তির আখড়ায় দিয়ে দেব।' সন্দীপন বলে, 'ঠিক বলেছেন, এই চেহাবা আখড়াতেই মানায়।'

টুনটুন কোমবে হাত বেখে দুজনকেই নস্যাৎ কবে দিয়ে বলে, 'না, নীল আমার ভাই। ভাইকে আমি আমার সঙ্গে খাস্তগীরের ইস্কুলে নিয়ে যাবো।'

'ঠিক ঠিক।' সবাই হাসে।

দেবযানী বলেন, 'আপনারা কেবল ওকে মোটা মোটা বলেন, টুনি পাখি রাগ করেছে।'

নীল এখন বাড়ির মধ্যে বেশ একজন কেউকেটা। সারাক্ষণ সবাই তার হাসি দেখছে, খেলা দেখছে, কান্না দেখছে ; খাওয়া দেখছে—দেখার লোকও হয়েছে অনেক! তিন দিদি তো পাগল, কানাইও তাই, আপনজন যুক্ত হয়েছেন বিমলেন্দু রায়। আর সবচেয়ে যে উল্লেখযোগ্য মানুষ সে হলো তার বাবা। সন্দীপন। বেশ একটু পুত্রপ্রেমিক হয়েছে। বুলুর বেলায় তো রীতিমত দাদা দাদা ভাব, মিলুর বেলায়ও

ছাড়া ছাড়া, টুনটুনের বেলাতেই মনোযোগের ভূমিকা, এখন পুরোমাত্রায় পিতা। কাজে যাবার আগে আদর, কাজ থেকে ফিরে আদর, হিসি করে দিলেও আপত্তি নেই। দেবযানী ঠাট্টা করেন কিন্তু ভালোও লাগে খুব। সন্তান দুজনের, দুজনে মিলে আদর না করলে মন ভরে না। শুধু সন্তানই বা কেন, দুজনের সংসারে এই পারস্পরিকতা সব কিছুকেই মনোরম করে তোলে। তখন কষ্ট আর কষ্ট থাকে না, অভাব আর অভাব থাকে না, দুঃখ আর দুঃখ থাকে না। এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে বলা যায় এই প্রথম একটা সাংসারিক পারস্পরিতার স্বাদ পেলেন তিনি।

কিন্তু আসল পারস্পরিকতার স্বাদে যিনি তাঁদের ভরিয়ে দিলেন তিনি বিমলেন্দু রায়। পরিশ্রমে দেবযানীর ক্লান্তি নেই, এতোদিন যে ক্লান্তি তাঁকে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলো তা তাঁর একা একা দায়িত্ব বহনের চাপ। তা থেকে তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। বিমলেন্দু রায়, সব সময়েই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছেন, সব সময়ে সহযোগিতায় উন্মুখ।

যেমন কখনো এসে দেখলেন দেবযানী একটু অন্যমনস্ক, একটু ভাবছেন। বলবেন, 'কী হয়েছে? কী ভাবছেন?'

দেবযানী বিরস মুখে বলবেন, 'দেখুন না, সনাতন বলছে কোথাও অমুকটা পাওয়া যাচ্ছে না, কী যে করি।'

অমনি সেই চিন্তার সঙ্গে চিন্তা মেলাবেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি অমুকটা পাওয়া খুব দুষ্কর হয়েছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?' এই বলে তিনি সেই অমুকের নানাবিধ বিকল্পের নাম বলবেন, কীভাবে পাওয়া যেতে পারে তার পরামর্শ দিতে থাকবেন। সন্দীপন বলে উঠবে, 'ডিসগাস্টেড। উঃ, তোমার সংসারের চিন্তা এখন রাখোতো দেবযানী।'

একথায় দেবযানী চুপ করে থাকেন না। আগের মতো ততো সহিষ্ণু বা শান্ত নেই এখন, তক্ষুনি জবাব দেন, 'যদি চিন্তা না করলে

চলতো তাহলে আর করতাম না।'

'তা করোনা, কে বারণ করেছে। এখানে ঘ্যান ঘ্যান করে লাভ কী? যা করবে নিজের মনে করো।' বুঝলেন বিমলেন্দু—সে অন্য প্রসঙ্গ তোলে, জমে ওঠে কথা, চা আসে ট্রে ভর্তি, ঘরে তৈরী কোনো খুচরো খাবারও হয়তো আসে সঙ্গে। হয়তো আরও দু একজন বন্ধুও এসে পড়ে, আড্ডা ভাঙ্গতে রাত দশটা।

যাবার আগে বিমলেন্দু রায় এ ঘরে উঁকি মারেন, 'শুনুন, আমার মনে হয় আপনি যা চাইছেন, সেটা আপনাদের মোড়ের ঐ ভুজার দোকানে দেখেছিলাম কয়েকদিন আগে। যাই হোক ও নিয়ে ভাববেন না, কাল আমি ঠিক এনে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকা মন হালকা হয়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'না না, আমি যোগাড় করে নিতে পারবো।'

'তা কেন পারবেন না', বিমলেন্দু স্মিতহাস্যে তাকান, 'আপনি যে কতো পারেন তা তো জানি। এ ভারটা আমিই নিলাম।'

আপনি যে কতো পারেন তা তো জানি এই কথা কটাও দেবযানীর শ্রবণকে তৃপ্ত করে।

দেবযানী দেখেছেন, যে যতোই নিষ্কামভাবে কিছু করুক না কেন, মনের অবচেতনে তার জন্য একটা প্রতিদানের চাহিদা ঠিক লুকিয়ে থাকে। একবার তাঁদের বাড়ির তলাকার কোন দুঃস্থ একটি পরিবারের একটি শিশুকে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। রক্ষা করার জন্য যদিও তাঁকে তাঁরা ডাকেননি শুধু ওষুধ নিতে এসেছিলেন। তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন তিনি। স্বামীর মতো তাঁরও মাঝে মাঝে এক একটা ঝোঁক চাপতো এক এক বিষয়ে। তখন চেপেছিলো এই চিকিৎসার প্রতি। চেপেছিলো অবিশ্যি সঙ্গত কারণেই। মিলু বাচ্চা বয়সে কি ভোগান ভুগতো টনসিল নিয়ে। জ্বরে সর্দিতে গলা ব্যথায় কখনো কখনো এমন কাতর হয়ে পড়তো যে ভয়ে কতো রাত মেয়ে কোলে নিয়ে বসে বিনিদ্র কাটতো। ছুটে ছুটে কেবল ডাক্তারের কাছে যাওয়া আর

ওষুধ আনা আর উপকার না হওয়া। হঠাৎ এক হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বন্ধু বেড়াতে এলো। দেখে শুনে ওষুধ দিল, চমৎকার সেরে গেল। সেই থেকেই তাঁকে হোমিওপ্যাথিতে পেলো। বন্ধুই বলেছিলো, 'একটা বাকস কেনো, অনেক ওষুধ পাবে তাতে, বই আমি তোমাকে যোগাড় করে দিচ্ছি।'

সেই থেকেই দেবযানী ওষুধ দেন। নিজের ছেলেমেয়েদের তো দেনই, পাড়ার বাচ্চারাও তাঁর রোগী। সন্দীপনকেও দিতে চান, সে খায় না, হাসে। বলে, 'কী করবো তোমাকে ভালোবাসি বলে তোমার ওষুধ খেয়ে তো মরে যেতে পারি না? বিধবা হতে যদি না চাও তো দয়া করে একটা ডাক্তার ডাকো।'

ওঁরা বাচ্চাটার অবস্থা বলে ওষুধ নিতে এসেছিলেন, তিনি অবস্থা শুনে দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়েই চক্ষুস্থির। বলা যায় প্রায় সদ্যোজাত শিশু, তার আঠেরো ঘণ্টা পেচ্ছাপ হচ্ছে না। অথচ এ কথাটাই বলেনি, বলেছে নেতিয়ে পড়েছে, মায়ের বুকে খাচ্ছে না, মাঝে মাঝে হেঁচকি টানছে।

এই দীর্ঘ জীবনে দেবযানী এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, মানুষের দুঃস্থতার একমাত্র কারণ তাদের অর্থাভাব নয়। অশিক্ষা এবং কায়িক শ্রমের অনীহাই বারো আনি জুড়ে আছে। এই পরিবারটি হচ্ছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাড়ির কর্তাটির পানের দোকান। সেখানে ডাবও বিক্রি করে, টফি লজেন্স সিগারেট এ্যানাসিনও পাওয়া যায়। মোড়ের মাথায় ভাল দোকান। দোকানটি তার বাবার। তাঁরই শ্রমে এতোদিন সচল ছিলো, সচ্ছল ছিলো। সম্প্রতি বাবা মারা গিয়ে পুত্র গদিতে বসেছেন। দুপুরে ভাত খেয়ে চারটা পর্যন্ত না ঘুমুলে তাঁর শরীর টেঁকে না। সকালে আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পরে তাসে না বসলে মানুষ খুন করতে ইচ্ছে করে। অতএব দোকান এখন বন্ধই থাকে প্রায়। খোলা অবস্থাতেও তৎপরতার অভাবে এবং শৈথিল্যে খদ্দেররা ভুরু কুঁচকে চলে যায় অন্য দোকানে। এখন অন্নাভাব

চলছে।

বাচ্চাটাকে তৎক্ষণাৎ দেবযানী হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বাবা মাও গেলেন সঙ্গে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রেখে এলেন তাদের কেয়ারে। ডাক্তাররা আশা দিতে পারেন নি, কিন্তু তবু পনেরো দিনের মাথায় ছেলে ভালো হলো। মায়েব অবিশ্রান্ত কান্নাভরা মুখে হাসি ফুটলো। দেবযানীর টানাটানিব সংসারে অর্থদণ্ড মন্দ হলো না।

ছেলে যে ভালো হলো সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। তবুও যেদিন তাব মাকে বলতে শুনলেন, কী কাণ্ড, কী কাণ্ড। ভাগ্যে উপরের দিদির ওষুধের উপর ভরসা না করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ওর বাবা যদি সময় মতো বুঝতে না পাবতো, ছেলে কি বাঁচতো।

জানালায় দাঁড়িয়ে পাশেব বাড়িব গৃহিণীকে বলছিলো জোরে জোরে, দৈবাৎই কানে গেল তাঁব। একটু থমকে থাকলেন, মনের ভিতরটা অপ্রত্যাশিত ভাবে কেমন একটা অদ্ভুত কষ্টে ছেয়ে গেল।

অবিশ্যি জীবনে এই একটা ঘটনাই ঘটেনি। এমন বেদনাবোধের উপলব্ধি তাঁব আবো হয়েছে। কালীকিঙ্কর সেন নামে এক ভদ্রলোক তাঁর বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তাঁর দ্বারা বাবা অনেক সময় অনেক উপকৃতও হয়েছেন। অতি চমৎকার মানুষ। আর তাঁকে যে কী ভালোবাসতেন। কালাকাকার স্ত্রী স্বামীর অনেক আগেই মারা যান। বোধহয় সন্তান হতে হতেই জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিলো। কাকীমার মৃত্যুটা খুব মনে আছে দেবযানীর। দেবযানীও তখন বিবাহিত এবং দুই মেয়ের মা। কাকীমা মারা গেলেন শেষ সন্তানের জন্মের তিনমাসের মধ্যে। কী অবস্থা তাঁদের সেই সময়ে। বাড়ি ছিলো নৈহাটিতে। কালীকাকার চাকরী ছিলো না তখন। অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে অন্তহীন দুর্দশা। এসব অবশ্য কিছুই জানতেন না তিনি। হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল এক অচেনা লোকের কাছ থেকে। এটা নীল জন্মাবার পরে। তিনি লিখেছেন কালীকিঙ্কর সেনের ছটি ছেলেমেয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে একান্তভাবেই অনাথ, বলা যায়

অনাহারে মারা যাচ্ছে, দেখবার শোনবার কেউ নেই। এদের যে কে কোথায় আছে কিছুই জানি না। কালীকিঙ্করবাবু মারা যাবার পরে তাঁর বালিশের তলায় একখানা অর্ধসমাপ্ত পোস্টকার্ড পাই। তাতে এই নাম ঠিকানা লেখা ছিলো। তাই জানতে পারছি। সঙ্গে অর্ধ-সমাপ্ত পোস্টকার্ডখানাও পাঠালাম।

অর্ধসমাপ্ত পোস্টকার্ডখানা পড়তে পড়তে দেবযানী দুই চোখের জলে ভেসে গেলেন। লিখেছেন, মনি মা, আমি মৃত্যুশয্যায়, সন্তানদের কার হাতে দিয়ে গেলাম জানি না। এটুকু জানি সংবাদ পেলে তুমি আসবে। আমি তোমাকে—এখানেই শেষ। সেই দিনই একটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন নৈহাটি, ছটি বালক বালিকা নিয়ে ফিরে এলেন। কাকীমার একভাই কলকাতাতেই থাকতেন, সেই ভাইকে তিনি চিনতেন, প্রায় জবরদস্তি করে তিনটিকে সেখানে রেখে তিনটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তারপর তাদের বন্দোবস্ত করতে কী ঝামেলা। কতো দৌড়ো-দৌড়ি কতো ছুটোছুটি। সন্দীপনও এই ব্যাপারে কম ধরাপড়া করেনি হোমরাচোমরাদের। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক প্রভাব খাটিয়ে সরকারী সাহায্যে খুব ভালো বন্দোবস্ত হয়ে গেল তাদের। তারা বোর্ডিংয়ে থাকবে, ইস্কুলে পড়বে, চারবেলা পরিপূর্ণ খাদ্য পাবে, খরচ নগণ্য। সেই খরচের অর্ধেকটা বহন করবার জন্য ওদের মামাকে বলে কয়ে হাতে পায়ে ধরে রাজী করালেন। বাকীটা নিজের। আর লোকাল গার্জিয়ানও তিনি থাকলেন। মামা রাজী হলেন না। কে এই ঝুট ঝামেলার মধ্যে মাথা গলায়। শেষে উৎপাত এসে ঘাড়ে পড়ুক আর কি। সেই ছেলেমেয়েরা এখন যোগ্য হয়েছে, বড়ো হয়েছে, বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ের বাবা মা হয়েছে—সে কী আজকের কথা? কিন্তু কী আশ্চর্য! কখনো ভুলেও তারা একদিন এসে দেখা করে না। বড়ো ছেলেটি নাকি একবার দেবযানীর পিত্রালয়ের কোনো আত্মীয়ের কাছে বলেছে, মনিদি আবার আমাদের কী করেছেন, করেছেন তো আমার মামা। মামা টাকা না দিলে আমরা কি বোডিংয়ে থাকতে পারতাম?

তবে হ্যাঁ, বোর্ডিংয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেটা ঠিক।

একথা শোনার পরেও তার মন এমনিই এক অকথ্য কষ্টে ছেয়ে গিয়েছিলো।

অবশ্য প্রাপ্তিরও তাঁর কোনো সীমা ছিলো না। হয়তো একের ঋণ অপরে শোধ করে, তাই মান-সম্মান ভক্তি ভালোবাসা কোনো কিছুরই কোনো অভাব ঘটেনি জীবনে। সবই অপর্য্যাপ্তভাবে পেয়েছেন। সন্দীপনের বন্ধুরা, ছাত্ররা, শিষ্য বা ভক্তরা আজ এই মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর প্রতি গভীর আত্মীয়তাবোধে আবদ্ধ। তিনিও কোনোদিন ভুলেও মনে করেন না আত্মজনদের চাইতে তাঁরা একবিন্দু কম। এদের প্রাণের মূল্য তাঁর কাছে তাঁর নিজের প্রাণের চাইতে বেশী।

মধ্যজীবন পর্যন্ত সন্দীপনের জগতই ছিলো তাঁর জগৎ। কিন্তু তারপরে তাঁর নিজস্ব জগতও গড়ে উঠেছে, সেখানেও তিনি সমান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলেই ভালোবাসে তাঁকে! ছোটো বড়ো সকলেই আপৎকালে ছুটে আসে তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ নিতে। সুতরাং কে কোথায় কতোটুকু আঘাত দিয়েছে তার হিসেব আর তিনি করেন না।

তবে কিছুই তো নিরবচ্ছিন্ন নয়? অন্ততঃ তাঁর জীবনে তো নয়ই। নিয়তি তার সঙ্গে ডান হাতে বাঁ হাতে জুয়া খেলেছে, এক হাতে দিয়েছে, এক হাতে নিয়েছে।

ঐ বিমলেন্দু রায়ও সেই নিয়তিরই একটা অংশ। তাঁর দ্বারা সুখ-দুঃখ দুই-ই তিনি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন।

॥ পাঁচ ॥

একদিন বিমলেন্দু রায় অসময়ে এসে দেবযানীকে ঘর মুছতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী!'

চমকে ফিরে তাকালেন দেবযানী, হেসে বললেন, 'ওমা আপনি!'

'ঘর কি আপনি রোজই মোছেন?'

'নিজের ঘর তো মানুষ নিজেই পরিষ্কার রাখে।'

'কিন্তু আপনি অসুস্থ।'

'সেটা অতীত। বর্তমানে অসুখের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই। বসুন বসুন, হাত ধুয়ে আসছি।'

'কানাই কোথায়?'

'ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গেছে।'

'কানাই ঘর মোছে না?'

'মোছে বৈকি। সময় পায় কোথায়?'

'ডাক্তার আপনাকে পরিশ্রম করতে বারণ করেছেন।'

'এটা কি একটা পরিশ্রম?'

'হ্যাঁ, এটা পরিশ্রম। আপনি সব সময়ই মনে রাখবেন বেশ একটা কঠিন রোগ আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে। সুযোগ পেলেই লাফাবে।'

'ওসব কথা থাক, চা দেব?'

'যদি মনে করেন কানাই সময় পায় না, একজন ঠিকে মেয়ে রেখে দিতে পারেন।'

'এ নিয়ে এতো ভাবছেন কেন বলুন তো? বাড়িতে তিনটে লোক কাজ করছে, দেখতেও তো খারাপ লাগে।'

'উপায় নেই। সন্দীপনের মার জন্য আলাদা লোক আপনার লাগবেই, উনি সম্পূর্ণ ইনভ্যালিড, আপনার চারটি বাচ্চা তাদের সামলাতেও লোক দরকার, সন্দীপন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, আপনি অসুস্থ এক্ষেত্রে অন্তত কিছুদিনের জন্য এভাবেই চলতে হবে। তারপর আপনি সুস্থ হয়ে গেলে আপনার সংসার আপনি যেভাবে খুশি চালান না, তাতে কার কী বলবার থাকতে পারে?'

'ঠিক আছে, পরে এসব আলোচনা করা যাবে, ঠাণ্ডা হয়ে বসুন তো। খুব গরম পড়েছে, এই রোদ্দুরে হঠাৎ এলেন, কী ব্যাপার?'

'আপনিও ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা

আছে।'

'বলুন।'

'সন্দীপন আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছে, ওর অাপিশ কলকাতা থেকে বম্বেতে স্থানান্তরিত হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'ও কী করবে?'

'তাই তো ভাবছি।'

'ওরা যা কাজ তার জন্য কলকাতাই ওর জায়গা। তাছাড়া পরিবার পরিজন নিয়ে আবার সেখানে গিয়ে নতুন সংসার পাতাও কঠিন।'

'তাই তো।'

'ছবি এঁকে এই বয়সেই সন্দীপন যে সম্মান পেয়েছে তার জন্য এই বাংলাদেশকেই আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। উচুদরের কাজের জন্য অর্থপ্রাপ্তি হয়তো তেমন ঘটেনা কিন্তু বোদ্ধা যদি দু'একজন জোটে তার মূল্যও কম নয়।'

'তাতো ঠিকই।'

'আরো আছে। একজন প্রতিভাবান লোককে আমরাই বা বাংলা দেশ ছাড়া হতে দেব কেন?'

'কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে—'

'আমি মনে করি চাকরিটা ওর ছেড়ে দেয়াই উচিত।'

'ও নিজেও তাই মনে করে।'

'স্বাভাবিক।'

'এবং ছেড়ে দেবে বলেও মনস্থির করেছে।'

'গুড। তার বাধাটা কোথায়? আপনি? আপনার আপত্তি?'

'তাও বলতে পারিনা, কতোগুলো ভাববার বিষয় তো আছেই? আপনি আমাদের জন্য যা করেন তার কোনো তুলনা নেই, কিন্তু দায়িত্বটা সন্দীপনের। আমি যদি উপার্জনক্ষম হতাম, তাহলে প্রশ্ন উঠতো না কিন্তু—'

'আমি যে উপার্জন করি সেটা ধরে নিতে পারছেন না, এইতো ?'

'না না মানে—'

'মানে আমি আপনার কেউ না, এই তো ?'

'না না—'

'সন্দীপনের মন সাদা কাগজের মতো, এ বিষয়ে তার নিজের মনে কোনো দ্বিধা আছে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিধা আপনার। সেই দ্বিধাতে সংক্রামিত হয়েই সে ভেবে পাচ্ছে না কি করবে।'

এখানে হাসলেন দেবযানী, 'আমার কথা ও এখন কিচ্ছু শোনেনা, ওর জগৎ এখন আপনিময়। তাছাড়া যা ওর ভালো লাগেনা তা করা ওর কুষ্ঠিতে নেই। মনে হয় না এই শহর ছেড়ে আর কোথাও এক পা নড়বে। বিপর্যয় যদি কিছু ঘটে ভাববে দেবযানীই তার মোকাবিলা করতে পারবে।'

'এই বিশ্বাস নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয় ?'

'আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, সম্মানেতে মরি, ঘাট থেকে জল এনে বাড়িতে স্নান করি। সম্মানের জন্য ঐ ঘাট থেকে জল আনতে একটু বেশী ঘামক্ষরণ হয়।'

'আমি বলছি সন্দীপন যদি সময় বেশী পায়, অনেক বেশী ছবি আঁকতে পারবে, অনেক বেশী উপার্জনও হবে। তাছাড়া এসব কাজ আনডিস্টার্ভড হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চাকরিটা ওর অনেক কিছুই শুষে নেয়।'

'আমি তাও জানি।'

'তা হলে আমার একটা প্রস্তাব আছে—'

'কী ?'

'সংসার চালনায় আপনি সুদক্ষ নাবিক সেটা অবিসংবাদী সত্য। এরকম একটা অপচয়হীন সংসার আমি ভাবতে পারি না।'

এখানেও হাসলেন দেবযানী, 'প্রশংসা শুনতে সব সময়েই খুব ভালো লাগে, তবে সত্যি সত্যি সংসার অভিজ্ঞ মানুষ হলে এই প্রশংসা বাঁধিয়ে রাখতাম।'

'ঠাট্টা নয়', বিমলেন্দু পোড়া সিগারেট বিশেষ ভঙ্গিতে টোকা দিয়ে বাইরে ফেললেন, 'আমি দশ বছর বয়েস পর্যন্ত আমার মা ঠাকুমার সংসার দেখেছিলাম, সেই ছাপ আমার মন থেকে মুছে যায়নি। সংসারের ছবি একে অপরের প্রতিবিম্ব। তাছাড়াও আপনার সঙ্গে আমার মায়ের কোথায় কোথায় অনেক মিলও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। যদিও মাকে আমার বিশেষ কিছুই মনে নেই, তবু তার বেশ একেবারে দুর্মর।'

দেবযানী চুপ করে রইলেন। বিমলেন্দু রায়ও চুপ করে থেকে বললেন, 'মায়ের সংসারে নয়, বয়েস বাড়তে বাড়তে বিমাতার সংসারে অবিশ্রান্ত নেই নেই শুনতে শুনতে অবিশ্রান্ত অনুভব করেছি এই নেই নেই রব অদক্ষ অপটু এবং অলস গৃহিণীর বুলি। আমার হতভাগ্য বাবা ভারবাহী গর্দভের মতো খেটে খেটে পরিশ্রমের যে আর্থিক বিনিময় তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দিতেন তা নেহাৎ অপাংক্তেয় ছিলো না। তারপর আমার নিজের গৃহিণী। আমি তাঁর সঙ্গে সাত বছর ছিলাম। কিন্তু যাক সেসব। এখন কথা হচ্ছে আপনি হিসেব করে বলুন, ঠিক কতো টাকা আপনার হাতে দিলে আপনার চালাতে কষ্ট হবে না।'

এতোক্ষণে দেবযানী বুঝতে পারলেন এতোবড়ো ভূমিকাটা কিসের? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখে কোনো কথা সরলো না। পরে স্তিমিত গলায় বললেন, 'আমি কোনোদিন নির্দিষ্ট টাকা হাতে নিয়ে সংসার করিনি। সন্দীপনের মাইনেটা সেই অঙ্কে পৌঁছোয় না, ছবি বিক্রীর টাকাও অনেক যুক্ত হয় তার সঙ্গে। কাজেই যখন যেরকম পাই সেরকমই চলে। তাছাড়া দেড় বছর দুবছর তা আপনার আয়ও যুক্ত হচ্ছে তাই ঠিক বুঝতে পারিনা অঙ্কটা কী।'

'আমার আয় যুক্ত হওয়াটা অপমানের, না?'

দেবযানী হেসে বললেন, 'হতো। কিন্তু সেই বোধ আপনি রাখতে দিলেন কই? আর্থিক পারমার্থিক দুই অর্থেই এই সংসার আপনার ভালোবাসা দিয়ে ভরা। আমাদের ছেলেমেয়েরা আপনারও ছেলেমেয়ে, সন্দীপন আপনাকে অভিন্ন হৃদয় ভাবে।'

'আর আপনি?'

'আমি? আমার আর কিসের মূল্য?'

'আপনি অমূল্য।' উঠে দাঁড়ালেন বিমলেন্দু, 'তা হলে ঐ ঠিক রইলো কেমন?' চলে গেলেন দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে। দেবযানী অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেন দরজা ধরে।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছেড়েই দিল সন্দীপন। না দিয়ে উপায় ছিলো না। এই মধ্যবয়সে এই চিত্রশিল্পীর জীবন নিয়ে অন্য এক অচেনা দেশে গিয়ে আবার নতুন করে ঘর বাঁধা সম্ভব নয়। কিন্তু মন যে সেজন্য বেশ খারাপ হয়েছে বুঝতে পারছিলেন দেবযানী। মন তাঁরও খারাপ। সংসার তো এখন কলরবে ভরা। চারটি শিশুপালন কম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়। তবু তো একটা নির্দিষ্ট আয় ছিলো। সন্দীপন কতো-গুলো নিয়ম নিষ্ঠার পদ্ধতিতে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। সেগুলো আবশ্যিক হোক বা না হোক সেই অভ্যাসের ব্যতিক্রম হলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মাইনের অঙ্কের সঙ্গে ছবির আয় মিলিয়ে সে সব মোটামুটি ভালো ভাবেই চলতো। এখন সেই গর্তটাকে কে পূরণ করবে? বিমলেন্দু রায় অযাচিতভাবে যা করছেন তা গ্রহণ বা বর্জন দুটোই সমান অস্বস্তিকর। তবু হাসিখুশি থেকে সন্দীপনের মনকে হালকা করে দেবার জন্য বলেছিলেন, 'এই ভালো হলো। সত্যি সত্যি যা তোমার ধর্ম এবার তা নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবে। আমিও ছবি আঁকায় এবার খুব মন দেব ঠিক করেছি।'

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাতের ঘড়ি খুলে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে সন্দীপন বললো, 'থাক, আর সান্ত্বনা দিতে হবে না।'

দেবযানী তার হাত ছুঁলেন, 'সান্ত্বনা কেন, তুমি তো এইরকমই একটা অবসর চেয়েছিলে। বাধ্য না হলে তো কাজটা ছাড়তে পারতে না?'

'ভেবোনা ভেবোনা, চাকরি আমি আবার শীগ্‌গিরই পেয়ে যাবো। অতো শোনাচ্ছো কেন?'

দেবযানী বুঝতে পারলেন না এটা শোনাবার কী হলো। এও বুঝতে পারলেন না মেজাজের পারাটা এতো উর্ধ্বে কেন। চাকরিটা তো সে বহুবার ছাড়তে চেয়েছে, বলা যায় দেবযানীব আপত্তিতেই ইচ্ছেটা সম্বরণ করতে হয়েছে বারে বারে। তবে কি এ-ও তার একটা অভ্যাসেব পরিণতি? তিনি আর কথা বাড়ালেন না, রান্নাঘরে চলে গেলেন। সন্দীপন ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। নীল তাব দুর্বোধ্য ভাষায় সম্ভাষণ জানিয়ে কোলে উঠতে চাইলো।

এখন সে বেশ বড়ো বালক, এক বছব পূর্ণ হয়ে গেছে। ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, ভারি ভারি পায়ে হাঁটে, বুলি কপচায়। এখন এ বাড়ির সে-ই প্রধান নায়ক। মানদা বলে, ছেলে তোমার জজ হবে। সনাতন বলে, উঁহু, মজিসটার হবে। সন্দীপন এখনই এই অশিক্ষা কুশিক্ষা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, এখনই তার জন্য সহজ পাঠের সবকটা খণ্ড এসে গেছে, উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ মহাভারত এসে গেছে, যোগীন্দ্র সরকারের সাতখানা হাসিখুশি এসেছে, নীল সব কটাই ছিঁড়তে পেরেছে, চিবিয়েও খেয়েছে কিছু। তবে সেই বিদ্যা তার পেটে থাকেনি, ফেলে দিয়েছে বমি করে। কিন্তু তার পিতার আদেশ সব সময় হাতের কাছে বই জুগিয়েই যেতে হবে, দেখতে দেখতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বড়ো হবে শিশু, তবে অনুরাগ হবে তাতে। সাধ্য নেই, কেউ বলবে বই ছিঁড়োনা।

আদর করতে করতে সন্দীপন বললো, 'এখন আমি গরীব হয়ে গিয়েছি বুঝলি? এখন আর তোকে রোজ রোজ বই ছিঁড়তে দিতে পারবোনা। আমার তুলি কলম দেব। তুই আঁকবি বসে বসে। কেমন?'

নীল তার লালাসিক্ত হাসিমাখা মুখ দিয়ে সন্দীপনের গাল ভিজিয়ে দিতে দিতে বললো, 'হুজজো হুজজো,' মানে বোধহয় শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া, বিমলেন্দু রায় এসেই যেটা করেন।

এসবের মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে দিন। দেবযানী তাঁর কথামতো প্রকৃতই আবার ছবি আঁকায় নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন। অসুস্থ অবস্থায়

যে সব ছবি এঁকেছিলেন, তা ছিলো বড়ো বড়ো সব চিত্রকরদের নকল। সেজানো, রুয়ো, ভ্যাঁনস—সন্দীপন বলে এঁদের রেখায় হাত পাকাও, এঁরাই, গুরু—কিন্তু এখন বেশীর ভাগই আঁকেন পোট্রেইট, এটা তিনি পারেনও ভালো, আয়ও বেশী। আস্তে আস্তে নাম হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে, কাজ আসছে, তা থেকে পুরোনো দেনার প্রায় অনেকটাই তিনি মিটিয়ে এনেছেন, আরো কোথায় কী আছে তার সদুত্তর দিতে পারে না সন্দীপন, বলে, 'যে এসে চাইবে বা চিঠি লিখবে তাকেই দিয়ে দিও বা দিওনা যা তোমার ইচ্ছে, আমি মনে রাখিনি।'

সংসারে অনটনের কোনো প্রশ্ন নেই। মাসের শেষে তাঁর কথামতো বিমলেন্দু রায় মুঠো ভরে এনে দেন, এখনো অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই তা গ্রহণ করেন দেবযানী, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করেন। এ টাকা তাঁর স্বামীর টাকা নয়, এ টাকা তাঁর সন্তানদের পিতার টাকা নয়, এই সত্যটা তিনি ভুলতে পারেন না। সন্দীপন এমনিতেই গুটোনো ছিলো, এখন পরিপূর্ণভাবে বাস্তব সম্পর্ক রহিত হয়ে আরো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সংসারের বিষয়ে একটা কথা শুনতেও সে নারাজ। তাকে বোঝানো যায় না এমন অনেক কিছু সমস্যা থাকে যা একমাত্র তাকেই বলা চলে। কিন্তু সর্ব বিমলেন্দু রায়।

আবার তা নিয়ে কোথায় একটা ক্ষোভও আছে। হঠাৎ হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দেবযানী লক্ষ্য করেছেন, এটা তার চাকরি ছাড়ার পর থেকেই হয়েছে। চাকরি ছাড়ার পর থেকেও বটে, টাকাটা এভাবে দেবতানীর কাছে দেবার পর থেকেও বটে। আগে অভাবে অভিযোগে স্বাচ্ছন্দ্যে যে ভাবেই হোক না কেন, আর্থিক পরিচালনার ভারটা ছিলো একান্তই সন্দীপনের হাতে। সেটা বিমলেন্দু রায়ের বদান্যতাতেই হোক বা ধার করে এনেই হোক বা উপার্জন করেই হোক, দেবযানী তার হাত থেকেই পেয়েছেন। এই ছবিটা অন্যরকম। এই অন্যরকম ছবিটাই সম্ভবত তার ভালো লাগছে না।

পরের টাকা জ্ঞানে দেবযানী ছেলেমেয়েদের খেয়ালেও যেমন

একবিন্দু প্রশ্রয় দিতেন না, নিজের সখসাধের কথাও যেমন বিন্দুমাত্র ভাবতেন না, তেমনি সন্দীপনের অকারণ অপব্যয়ের ইচ্ছেকেও দমিত করার চেষ্টা করতেন। আগেও করেছেন। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করার স্বভাবে তাদের মা ছেলের সংসারে একদা যে ঋণের পাহাড় তিনি জমা থাকতে দেখেছেন, তাগাদার যে অসম্মান প্রতিনিয়ত সহ্য করেছেন তার আর পুনরাবৃত্তি চাননি। তখনও এরকমই চটে গেছে সন্দীপন। কিন্তু এখন সে অন্যভাবে হূল ফোটায়। তখনকার রাগে যে সারল্য ছিলো এখন তা অনুপস্থিত। এখন কঠিন গলায় বলে, 'টাকাটা কি তোমার যে তোমার এতো দাপট?'

দেবযানী বলেন, 'দাপট কিসের?'

'কই, এখন তো অন্যের টাকাকে নিজের টাকা বলে ভাবতে একটুও দ্বিধা দেখিনা। তখন তো মনে হতো একেবারে সতীগিরির চূড়ান্ত।'

দেবযানী বলেন, 'অন্যের টাকাকে নিজের টাকা বলে ভাবি না বলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক পয়সাও আমি বেশী খরচ করতে চাই না।'

হিংস্র হয়ে সন্দীপন বলে, 'যদি না-ই ভাবো তা হলে নিজের সুখের জন্য অতগুলো দাস-দাসী রেখেছ কার পয়সায়? আমি তো অতো রোজগার করিনা।'

'তারা আমার পরিচর্যা করেনা।' রাগ করে আলমারী খুলে টাকার বাণ্ডিলটা সন্দীপনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বাথরুমে ঢুকে যান।

পরাজিত বালকের মতো উন্মত্ত ক্রোধে সন্দীপন দুমদাম দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে।

এই ধরনের গোলযোগ প্রায়ই করে। খুবই বিশ্রি লাগে। অশান্তির সঙ্গে অনেক দিন ঘর করেছেন, সংসার সমুদ্রে অনেক হাবুডুবু খেয়েছেন, এখন আর সহ্য করতে পারেন না।

একদিন রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি আবার কোথাও একটা চাকরির খোঁজ করো।'

'কেন?' সন্দীপন তির্যকভাবে তাকালো স্ত্রীর দিকে।

'আর নয় তো বিলাসিতা ছাড়ো, নিজের যতটুকু আয় তার মধ্যে থাকার চেষ্টা করো সবাই মিলে।'

'মহারাণী কি আর গরীবখানায় টি[*]কতে পারবেন তখন? তিনখানা পরিচারক পরিচায়িকার সেবা না হলে কি তাঁর চলবে?'

এই একটা মাথায় ঢুকেছে তিনজন পরিচারক পরিচারিকা। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে দেবযানী বললেন, 'দ্যাখো, মা তোমার, তাঁর মলমূত্র পরিষ্কার করা তোমার কর্তব্য, আমার নয়, তুমি করোনা বলেই লোক লাগে, কানাইকে অবিশ্রান্ত একটা টাট্টু ঘোড়ার মতো আমি ছোটাই না, তুমিই ছোটাও সে-ও তোমারি কারণে, আর সনাতন যা রান্না করে তা আমি একা খাই না, তোমার সন্তানরা খায়, তুমি খাও, তোমার মা খান, তোমার বন্ধুবান্ধব যে যখন আসে, তারাও খায়, সেখানেও আমার অংশ নগণ্য। তুমি বারে বারে একথাটা আমাকে বলবে না।'

'নিশ্চয়ই বলবো। একশোবার বলবো। হাজারবার বলবো। মেয়েরা লোভী, টাকার লোভ তাদের মজ্জাগত। যার টাকা, আছে সে-ই তাদের কাছে সব আর তুমিই হচ্ছো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।'

দেবযানী আপাদমস্তক একটা আগুনের শিখা নিয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন পাথর হয়ে। তাঁর ভীষণ ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে, অনেক দিনের অনেক অভিযোগ বিষের মতো উগদার করতে ইচ্ছে করে, সংসারের সমস্ত গ্লানির উর্ধ্বে রাখার চেষ্টায় সন্দীপনকে তিনি কী কী করেছেন একটা একটা করে তার তালিকা পেশ করতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে হেমলতার পুত্র আর এর চেয়ে বেশী কী ভাবতে পারে?

কিন্তু কিছুই করেন না, প্রবৃত্তি হয় না। চলে আসেন নিজের ঘরে। মনে মনে স্থির করেন, এবার সময় হয়েছে, এবার তিনি দিল্লী যাবেন। যাবেন চিরকালের জন্য। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। হাত দুটো অকারণেই মুষ্টিবদ্ধ হয় আর খোলে, বুকের স্পন্দন শাড়ির উপর দিয়ে ঢেউয়ের মতো ওঠাপড়া করে।

এই ধরনের ঝগড়া প্রায় নৈমিত্তিক হ'য়েই উঠেছিলো তাদের

জীবনে। একদিন ঠিক সেই সময়েই বিমলেন্দু এসে হাজির। একজন ঠিকে কাজের মানুষ নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়েন দেবযানী। রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন, 'আবার একে এনেছেন কেন? আপনি কি আমাকে টাকা দেখিয়ে বাহবা নিতে চান?'

দেবযানীর এই মূর্তি দেখে হকচকিয়ে যান তিনি। তাকিয়ে থেকে বলেন, 'কেন, আমি তো কাল বলেছিলাম—মানে আপনি তো কাল—ঐ যে মানদা চলে যাবে, বললেন—মানে এই মেয়েটি খুব দুঃখী, আমাব প্রেসে ওর—

'দীন দুঃখীর উপর এতো দরদ থাকলে আশ্রম খুলুন। আমাকে অপমান করবেন না।' বলতে বলতে মুখ ঢাকেন দুহাতে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়তে থাকে জল। সন্দীপন গম্ভীরভাবে চলে যায় বাথরুমে।

॥ পাঁচ ॥

বাতি জ্বলে আর নেবে। আলো ফোটে আর অস্ত যায়। মানুষ হাসে আর কাঁদে। এই করতে করতেই কখন পৌঁছে যায় গন্তব্যে, তার-পর যার পারানির কড়ি যেমন তেমনি তার গতি।

ঈশ্বরের সেই আইন অনুসারেই দেবযানী চিরকালের জন্য দিল্লী চলে যেতে পারেননি, চিরকালের জন্য রাগ মনে রাখতে পারেননি, চিরকালের জন্য দুঃখবোধও স্থায়ী হয়নি। কিন্তু এই বোধ তাঁর স্থায়ী হয়েছে, তিনি নিজেকে যতোটা স্বনির্ভর মনে করেন তা তিনি নন, যতোটা স্বাবলম্বী মনে করেন তা-ও তিনি নন। তাঁর মনও নির্ভর চায়, অবলম্বন চায়। সাহায্য চায়। অবচেতনে এই অভাববোধ তাঁর লুকিয়ে ছিলো। সেটাই সেদিন আঘাতের বেগে প্লাবন হয়ে বেরিয়ে এলো। তা নৈলে বিমলেন্দু রায়কে দেখামাত্রই অমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতেন না। ওটা তাঁর সমর্পণ। দুঃখবিমোচনের নিঃশর্ত আশ্রয়।

সত্যিই নিঃশর্ত। বিমলেন্দু রায় কোনোদিনই তাঁর কাছে কোনো বিনিময় চাননি। নিটোল সংসারটাকে ভাঙবার তিলতম চিন্তাও কোনো-দিন তাঁর মাথায় আসেনি। তিনি সন্দীপনকে যতো ভালোবাসতেন, তার সন্তানদেরও ততোই ভালোবাসতেন। তাদের সুখ দুঃখ ভালো মন্দ এই নিয়েই তিনি বিব্রত। যদিও তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দেবযানীর পায়েই নিবেদিত ছিলো, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সেটা নিজের অন্তরের মধ্যেই নিহিত রেখেছিলেন। দেবযানীর কাছেও সেটা বিশেষ স্পষ্ট ছিলো না। কিন্তু আগুন তো চাপা থাকে না? একদিন সেটি প্রকাশিত হলোই। তিনি হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হলেন এবং প্রায় একমাস তাঁকে হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করে থাকতে হলো।

সন্দীপন পাগলের মতো যাচ্ছে আসছে দেখছে শুনছে, অস্থির হয়ে গেছে এই অসুখের ব্যাপারে। ডাক্তার বলেছে হার্টের অবস্থা অতি শোচনীয়, যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে তাঁর চ'লে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। এই খবর জেনে থেকে তার খাওয়া গেছে, ঘুম গেছে, ছবি আঁকা গেছে, শুধু সারাদিন উচ্চকিত কখন যাবে হাসপাতালে। ডাক্তারের একথাটা অবিশ্যি দেবযানী জানতেন না। তবুও তাঁর মন থর থর করে, তাঁর দিনরাত উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে বিধ্বস্ত।

এরমধ্যে সন্দীপনের একদিন শরীর খারাপ হলো, সে যেতে পারলো না, দেবযানী একাই গেলেন। তাঁরা ছাড়া দেখতে যাবার আর কেউ নেই বিমলেন্দু রায়ের। বোন থাকে সিন্ধ্রীতে, তাকে খবর দেননি। ঘরে কারো উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ বুজে থেকেই বললেন, 'সন্দীপন?'

দেবযানী বললেন, 'না, আমি। ও আসতে পারলো না, খুব সর্দি হয়েছে।' কপালে হাত রাখলেন, 'কেমন আছেন', সেই হাতের উপর হাত চেপে বিমলেন্দু রায় বললেন, 'ভালো, খুব ভালো। এতো ভালো আমার জীবনে লাগেনি।' তারপর দেবযানীর হাতটা কপাল থেকে এনে বুকের উপর রেখে বললেন, 'দেবযানী, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভক্তরা যেমন ঈশ্বরকে ভালবাসে তেমনি। শিশুরা যেমন মাকে ভালবাসে তেমনি।

মানুষ যেমন যৌবনকে ভালবাসে তেমনি। ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যাচ দ্রবিনাং ত্বমেব। ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব। ইচ্ছে হলে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার, ইচ্ছে হলে পরিত্যাগ করতে পার, ইচ্ছে হলে সন্দীপনকে বলে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করতে পার, যা তোমার খুশি। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এই আমার সবচেয়ে বড় সত্য। বোসো।'

দেবযানী বসলেন।

'তোমাকে আমি কোনোদিন নাম ধরে ডাকিনি। মনে মনে সহস্র-বার উচ্চারণ করেছি। শয়নে স্বপনে জাগরণে এই নাম আমার সর্বস্ব। দেবযানী, তুমি আমার উপব রাগ করছো না তো? একটু জল দাও।'

দেবযানী জল দিলেন। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। সামনে টানা লম্বা বারান্দা, পাশে পাশে ঘর। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভিতর থেকে যে অনুভূতি তীব্র হয়ে বেরিয়ে এলো তা তাঁর চোখের জল।

এসব কথা শুনে তিনি বিস্মিত হননি, রাগান্বিতও হননি, চমকেও ওঠেননি, শুধু একটা গভীর বেদনা মুচড়ে উঠেছে বুকের মধ্যে, সে বেদনা সন্দীপনের জন্য। কেননা তিনি এই প্রথম প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করলেন অথবা স্বীকার করলেন এই মানুষটিকে তিনিও ভাল বাসেন। বিমলেন্দু রায় খুব ছটফট করছিলেন, নার্স ঘরে এলো, পালস দেখলো, ভুরু কুঁচকালো, তারপর ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণ হলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বাড়িতে সন্দীপন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ঘরের এমাথা ওমাথা পাইচারী করেছিলো, দেবযানীকে দেখেই ব্যস্তভাবে বললো, 'কী, কেমন দেখলে?'

দেবদানী চোখ নিচু রেখে বললেন, 'ঐ এক রকমই।'

'কী বললো?'

'কী আর বলবেন।' চোখ তেমনিই নিচু। গভীর অপরাধবোধে

স্বামীর দিকে তাকাবেন এমন সাহস তাঁর ছিলো না।

'ডাক্তারের সঙ্গে কোনো কথা হলো?'

'না।'

'একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি।'

'কী?'

'ডাক্তারের ধারণা, যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে একসপায়ার করতে পারেন।' সন্দীপন ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললো, 'আমি তোমাকে বলিনি, বলতে পারিনি, বিমলেন্দুর কিছু হলে আমার এক মুহূর্তও বাঁচবার ইচ্ছে থাকবে না।'

দেবযানী নিস্পন্দ।

নিজের বিষয়ে সন্দীপন জ্ঞানী, তার পড়াশুনো অগাধ, পাণ্ডিত্য অনুকরণযোগ্য, সিদ্ধান্ত অমোঘ। সেখানে সে টলে না, আপোষ করে না, ভেঙেও পড়ে না। কিন্তু তার বাইরে তার মন ছেলেমানুষের মতো নরম। ভালোবাসাও অনেকটা তাই। শিশুর মতোই সেই ভালোবাসা একাধারে অত্যাচারী, স্বার্থপর, অসূয়াসম্পন্ন আবার নির্ভেজাল, নিখাদ নিঃশঙ্ক ক্লেদহীন, গ্লানিহীন। নিজের মাকেও সে এইভাবেই ভালোবেসেছে, স্ত্রীকেও সেইভাবেই ভালোবাসে, বন্ধুর প্রতিও তাই। মায়ের ভালোবাসাটা এখন অতীত কিন্তু স্ত্রী এবং বন্ধু দুজনই তার পক্ষে একেবারে টাটকা সজীব। এদের একজনকে ছাড়াও যে জীবন চলতে পারে এটা ভাবা তার চরিত্রের পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য সেই শোক তাকে পেতে হলো না। মৃত্যুর প্রান্ত ছুঁয়ে ভালো হয়ে উঠলেন বিমলেন্দু রায়। এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন হঠাৎ তাঁর বালিশের তলা থেকে যে কাগজের টুকরোটি আবিষ্কার করলো সন্দীপন সেটি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। হাসপাতাল থেকে সন্দীপনই ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিলো বিমলেন্দু রায়কে। তিনি তখনো বেশ দুর্বল, নির্দেশ আছে আরো সপ্তাহকাল বিশ্রামে থাকার। সঙ্গে

মিলুকে নিয়ে গিয়েছিলো। মিলু বিমলেন্দুকে ধরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল সন্দীপন। দেখার আসল উদ্দেশ্য কিছু ছবির বই সে দিয়েছিলো অসুস্থ মানুষটিকে অবসর যাপনের জন্য। সেই বই-ই একটা তুটো পড়ে রইলো কিনা। সেটার জন্য বালিশটা সরিয়েছিলো, তখুনি একটা কেউটে সাপ ছোবল মারলো তাকে। এক চিলতে কাগজে গোটা গোটা করে লেখা।

দেবযানী, তুমি আসনা কেন? তোমার অদর্শনে আমার দিন আব রাত শুধু অসহ্য কষ্টে ভরে থাকে।

সেই চিবকুটটি নিয়ে গিয়ে সন্দীপন শান্তভাবেই বিমলেন্দু রায়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠেছিলো, তাঁকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে শান্তভাবেই নিজের বাড়িতে এসেছিলো। তাবপব শান্তভাবেই অপেক্ষা করেছিলো ছেলেমেয়েবা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত।

সারাদিন সংসারের সকল ধান্দায় ক্লান্ত দেবযানী যখন শুয়ে পড়লেন নীলের পাশে তখনি সন্দীপন ডাকলো তাঁকে। বললো, 'একটু উঠে এসো।' তন্দ্রাচ্ছন্ন দেবযানী মাথার কাছে চেয়াবে উপবিষ্ট স্বামীব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার কী বাকী রইলো।' ঘন ঘন পা নাচিয়ে সন্দীপন বললো, 'অনেক।'

'আমি এখন উঠতে পারছি না।' হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'এসো।'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

গলার স্বরে দেবযানী চকিত হলেন, পুরো চোখ খুলে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো খারাপ খবর নাকি?'

'এ ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, আমার স্টুডিয়োতে এসো।'

কোণের দিকের একটি ছোট্ট ঘরকে সাজিয়ে গুছিয়ে সন্দীপনকে স্টুডিয়ো তৈরী করে দিয়েছেন দেবযানী। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে পিছনে পিছনে এলেন সেই ঘরে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সন্দীপন বললো, 'বিমলেন্দু কি তোমাকে কখনো কোনো চিঠি লিখেছে?'

'না তো।'

'এ চিঠিটা কি তোমাকেই লেখা নয়?'

ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় কাগজটা মেলে ধরলো তার চোখের তলায়। মুহূর্তের জন্য হৃদস্পন্দন থেমে গেল দেবযানীর। কথা বলতে পারলেন না।

'এ রকম কটা প্রেমপত্র তোমরা বিনিময় করেছো?'

দেবযানী চুপ।

'কদ্দিন ধরে এই লুকোচুরি খেলছো। আমার সঙ্গে।'

দেবযানী চুপ।

'জবাব দাও।'

দেবযানী চুপ।

'কাল আমি তোমাকে দিল্লী মেইলের একটা টিকিট কেটে দেব, তুমি আর আমার এখানে থাকতে পারবেনা।'

এখানেও দেবযানী চুপ। অসহ্য কষ্টে সন্দীপন অনেকক্ষণ নিজের হাত নিজে মুচড়োলো তারপর দেবযানীকে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল দরজার বাইরে। দেবযানী মুখ থুবড়ে পড়লেন, ঠোঁটে আর নাকে চোট খেয়ে লবণাক্ত রক্ত বেরিয়ে এলো ফিনকি দিয়ে।

রাতটা যে কীভাবে কেটেছিলো এখন কি আর মনে আছে সে কথা? আজকের ষাট উত্তীর্ণ দেবযানী সেদিনের তিরিশ উত্তীর্ণ মেয়েটিকে ভাবলেন। সেই রাতে কী তার করণীয় ছিলো? কী বলবার ছিলো? সারা রাত ঘুমোননি। এই আজকের রাতের মতোই বিনিদ্র চোখে অন্ধকার মশারির তলায় বেদনাবিদ্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। এক সময়ে ভোর হয়ে গেল। নীল উঠলো সর্বাগ্রে, তারপর বুলু। সামনেই বুলুর ষান্মাসিক পরীক্ষা, সকালে উঠে সে পড়ে। আর নীলের তো কাকভোরে ওঠা চাই-ই চাই। উঠবে, প্রাতঃকৃত্যাদি করবে, হাসবে খেলবে, মা বাবাকে আদর করবে, ফূর্তির ঢল নামে তার সেই সময়ে। আধো ঘুমে সন্দীপনও ছেলের এই খেলা উপভোগ করে।

বুলু মিলু তাদের ঠাকুরমার ঘরেরই একদিকে একটি বড়ো তক্তাপোষে ঘুমোয়, আর এ ঘরের দুটি মুখোমুখি খাটের একটিতে নীলকে নিয়ে তিনি শোন, অন্য খাটে টুনটুনকে নিয়ে তার বাবা। দুটি খাটের ব্যবধান এক ফুটের বেশী নয়, হাত বাড়ালেই একে অপরকে ছুঁতে পারে। সেই সকালে নীল নিজের খাট থেকে নেমে বাবার সেই খাটে গিয়ে বাবাকে পেলো না। একা একা অঘোরে ঘুমোচ্ছে টুনটুন। সন্দীপন রাত্রে আর এ ঘরে আসেনি, নিজের স্টুডিয়োতেই ছিলো।

কানাই চা এনে রেখে গেল। বাবুকে না দেখেও তার কোনো ভাবান্তর হলো না। ভাবলো বাথরুমে গেছেন। দেবযানীও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না 'চাটা ও-ঘরে দিয়ে আয়।'

আস্তে আস্তে বেলা বাড়লো, সংসার সজাগ হয়ে উঠলো, তারপর একযোগে বুলু মিলুর মিলিত কণ্ঠের একটা হর্ষধ্বনি কানে এসে পৌঁছলো, বি আর এসেছেন বি আর এসেছেন। মা বাবা বি আর এসেছেন— লাফিয়ে উঠলো ঘুমন্ত টুনটুন, লাফিয়ে চলে গেল ও-ঘরে, টলে টলে নীলও চলে গেল, দেবযানী শোবার ঘর থেকে পর্দার ফাঁকে দেখলেন, চারটি সন্তানকে জনক হয়ে এক সঙ্গে বুকের মধ্যে সাপটে ধরেছেন বিমলেন্দু রায়। গভীর আবেগে আলাদা আলাদাভাবে চুমু খাচ্ছেন, চোখে মুখে বিশ্বভুবনের স্নেহমাখা আনন্দ।

বলা যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপন ঘরে ঢুকলো, আদেশের গলায় বললো 'বাইরে আসুন।' চকিত দৃষ্টিতে সন্দীপনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলেন্দু রায় বললেন, 'কী হয়েছে ? চোখ মুখ এ রকম দেখাচ্ছে কেন ? মিসেস মিত্র কোথায় ?'

দাঁতে দাঁত চেপে সন্দীপন আবার বললো, 'বাইরে আসুন।'

দুর্বল পায়ে বিমলেন্দু রায় উঠে দাঁড়ালেন, বুলুকে বললেন, 'মাগো, শীগগির আমার জন্য এক কাপ চা করো তো, দেখছো, কেমন হাত-পা কাঁপছে। বুঝলেন সন্দীপন, কোনোদিন এই দেহ আমাকে এতো

বিড়ম্বিত করেনি।'

ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেলেন দুজনে। ঘণ্টাখানেক বাদে সন্দীপন একা ফিরে এলো। বুলু বললো, 'বি আর এলেন না? আমি বি আর-এর জন্য নিজে ব্রেকফাস্ট তৈবী করেছি বাবা, সত্যি বলছি, মা-ও দেখিয়ে দেয়নি, সনাতনদাকেও হাত দিতে দিইনি।'

সন্দীপন জবাব দিল না। মেয়েরা স্কুলে গেলে, বাড়ি নির্জন হলে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'ভেবেছিলাম, তোমাকেই আর এ বাড়িতে থাকতে দেবো না। পরে মনে হলো এটা এখন আব একা আমার বাড়ি নেই। এ বাড়িতে আরো কয়েকজন অংশীদার আছে। আমার মা আর আমার চার সন্তানেব আমাব সমানই অধিকার। তারা এই মুহূর্তে আমার মুখ চেয়ে বেঁচে নেই, তুমিই তাঁদেব রক্ষয়িত্রী, সুতরাং তুমি ইচ্ছে হলে থাকতে পারো। যেতে হলে যেতে পাবো। বিমলেন্দু রায়কে আমি আর কোনোদিন এ বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি, ইচ্ছে হলে তাকে বিয়েও করতে পার, যা তোমার খুশি।' তারপর হঠাৎ দেবযানীর লম্বা চুলের একটা গোছা ধবে টেনে প্রায় উপড়ে দিতে দিতে কান্নাবিজড়িত গলায় বলতে লাগলো, 'আমাকে ঠকালে কেন, ঠকালে কেন, ঠকালে কেন?'

॥ ছয় ॥

এর পর যে কেমন করে ছটা মাস কেটেছিলো কে জানে। অনেকগুলো দিন একটা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলো, একটা বিষাদের ঘন ছায়া গ্রাস করে রাখলো বাড়িটাকে। সকলের চোখে মুখেই একটা উৎসুক জিজ্ঞাসা, 'কী হয়েছে, কী হলো?'

তিন বছরের অভ্যাসে প্রত্যেকটি অধিবাসীই ভুলে গিয়েছিলো, বিমলেন্দু রায় নামের কোনো লোক কোনোদিনই অনুপস্থিত ছিলেন এখানে। বিপদ আপদ প্রয়োজন সব কিছুতেই সকলের জন্য যিনি এক-পায়ে খাড়া, তার জন্য অভাববোধ স্বাভাবিক।

সারা বাড়িময় স্মৃতি ছড়ানো। নীলের ছোট্টো জীবনের সব সরঞ্জামই তাঁর আনা। বুলুর কিশোরী জীবনের প্রথম শাড়িটি থেকে তার নব উগদত সখ-সাধের সব উপকরণই তিনি স্তূপ করেছেন, মিলু-টুনটুনের জামা জুতো ফিতে আদর আবদার খেলনা সবই তাদের বি আর, সন্দীপনের দামী দামী রং-তুলি কাগজ ইজেল দুর্মূল্য বই কিছুরই অভাব নেই ঐ একই ব্যক্তির জন্য। এমন কি হেমলতার যতো গোপন খাবার ইচ্ছেকেও গোপনেই তিনি পূরণ করেছেন। এটা তাঁর যথেষ্ট পয়সা আছে বলে না, ইচ্ছে অনিচ্ছে আগ্রহ অবসাদ মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম অপ্রেম সবই এই সংসারে উৎসর্গ করেছেন বলে এবং এই-ই তাঁর চরিত্র লক্ষণ বলে। মানুষ তো পাষাণ নয়, বুকের মধ্যে হু হু করে বৈকি। তবু মনে মনে বলেন, এই ভালো এই ভালো।

হঠাৎ বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে একদিন সন্দীপন বললো, 'বিমলেন্দু নাকি ঋণের দায়ে তার প্রেসটা বিক্রী করে দিয়েছে।'

দেবযানী চমকে উঠলেন। একটু পরে সহজ ভাবেই বললেন, 'ঋণের দায়ে? কেন?'

'আজ ঐ ছাপাখানার ফটিকবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, বললেন, কিচ্ছু করেন না, চলবে কী করে? বললে বলেন, আপনারা চালাতে পারলে চালান, নইলে বেচে দিন। শেষে ঐ বেচে দিতে হলো। তা-ও সব ধার মিটলো না।'

'কী আশ্চর্য।'

'ঐ খবর শোনার পর থেকেই মনটা খুব খারাপ লাগছিলো, সন্ধেবেলা সেখানেই গিয়েছিলাম।'

'ও।'

'ভুলতে চাইলেই—কি ভোলা যায়? আমি কি এতোই অকৃতজ্ঞ? আর বিমলেন্দুও কি ভুলতে পারে? দেখেই চোখের জল। প্রেসারে ভুগছে, একা থাকে, ভারি খারাপ লাগলো। আমি ওকে আসতে

বলেছি।'

'ও।'

'মনি, বিমলেন্দুব উপব আমার কোনো বাগ নেই, রাগ আমার তোমাব উপবে। তুমি আমায় ঠকালে কেন?'

সহসা দেবযানী দুহাতে জড়িয়ে ধবলেন সন্দীপনকে, বুকেব মধ্যে মাথা ঘষে ঘষে বলতে লাগলেন, 'আমি তোমাকে ঠকাইনি, ঠকাইনি, আমি তোমাকে ঠকাতে পারি না। তোমাকে ছাপিয়ে আমার সন্তানরাও আমার কাছে বড়ো নয়। আমাকে তুমি বিশ্বাস কবো।'

সন্দীপনও জড়িয়ে ধবলো স্ত্রীকে। তাদের মিলিত অশ্রু ধুয়ে দিল তাদেব হৃদয়বেদনা।

কিন্তু যা যায় তা আব ফিবে আসে না। এলোও না। ফলের মধ্যে পোকা ঢুকেছে, কে তাকে উচ্ছেদ কববে? বিমলেন্দু বায় আবার এলেন বটে। আবার তেমনি কবেই সংসারেব ভাব তুলে নিলেন মাথায়। সন্দীপন দায়িত্ব এড়িয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে আবাব আপন কাজে একাগ্র হলো, তবু ফাঁক রয়ে গেল কোথায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, অনাহার কতো কিছু ঘটে গেল বিশ্বভুবনে কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন মনে আর শান্তি ফিরে পেলো না সন্দীপন।

প্রথম প্রথম সে খুব খোলা মনেই এই পুনর্মিলনকে গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তার সেই মানসিকতা মনঃস্তত্ত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো।

চেষ্টা করেও সে নিজেকে সংযত রাখতে পারেনা। দেবযানী যা করেন যা বলেন সবের মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ অন্য একটা ছায়া দেখতে পায়। এমন কি স্নানটান করে একখানা ভালো শাড়ি পরে ফিটফাট হলেও তার চোখের দৃষ্টি অন্য রকম হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি স্নানটান করে ফিটফাট হওয়াটা একেবারেই চোখে পরার মতো নয় তা নয়। বেশীর ভাগ দিনই ঠিক খাবার আগে দৌড়ে

ঢোকেন বাথরুমে, ঝুপঝাপ জল ঢেলে বেরিয়ে এসে কোনো মতে মাথায় চিরুণীটা বুলোন কি বুলোন না চলে আসেন টেবিলে। এখন মানদা নেই, নীলের মতো দস্যু ছেলেকে নাইয়ে খাইয়ে জেদ মতলব রক্ষা করে ধর ধর করতে করতেই তো অস্থির। অন্যান্য সন্তানরাও এমন কিছু বড়ো হয়ে যায়নি যে কারো জন্যই কিছু না করলে চলে। নাতিবৃহৎ সংসারের কাজ সহজে ফুরোতে চায় না। তার উপরে যখনি যতোটুকু সময় পান, রং তুলি নিয়ে বসেন ঘরের কোণে। সাজসরঞ্জাম স্টুডিয়ো বলতে খাটের পিছনে উত্তরের আলোয় একটি দেয়ালের ঠেসান আর একটি নিচু ডেস্ক। উপার্জনের স্বাদ পেয়েছেন তিনি, এই উপকরণই যথেষ্ট। অবশ্য রং-তুলি কাগজের অভাব নেই, এ বিষয়ে সন্দীপনের আগ্রহ উৎসাহ এবং হাত সবই দরাজ।

তারি মধ্যে কোনো কোনোদিন রান্নাবান্না সেরে সনাতন নিয়ে নেয় নীলকে। ভুলিয়ে ভালিয়ে 'কাক খায়, বাবু খায়' বলে খাওয়ায়, ধুইয়ে মুছিয়ে নিচে যায়, রাস্তার ধারের ফুটপাতে গিয়ে বাস দেখায়, ট্রাম দেখায়, জুজু হয়ে ভয় দেখায়, উল্টোদিকের পানের দোকানে এসে বসিয়ে দেয় পানওয়ালার কোলে—দেবযানীর ভারি সুবিধে হয়ে যায় তাতে। অবসর পেয়ে ভালো করে স্নান করেন, ধোপদুরস্ত শাড়ি পরেন, পরিপাটি চুল আঁচড়ান, টিপ পরেন, মনটাই হালকা হয়ে যায়। হাসিমুখে সন্দীপনের স্টুডিয়োতে গিয়ে দাঁড়ান। তেল সাবানের সুগন্ধে ছবি থেকে চোখ তুলে তাকায় সন্দীপন তারপরেই ভাঙ্গ তির্যক হয়ে ওঠে। সিগারেটের সঙ্গে ঠোঁটে এক টুকুরো বাঁকা হাসি বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার ভারি যে সাজগোজ? কেউ আসবে নাকি অসময়ে? রাধিকার মন উতলা?'

কেউ মানে বিমলেন্দু রায়। তিনি আসেন সকালে বিকেলে। আপিসে যাবার মুখে একবার, ফিরে এসে একবার। ক্বচিৎ কদাচ অসময়েও আসেন। আপিসের গাড়িতে আপিসেরই কোনো কাজকর্মে বেরুলে চট করে ঘুরে যান একবার। শুনতে নিরীহ এই প্রশ্নটি যে তারই ইঙ্গিত বুঝতে একটুও দেরী হয় না দেবযানীর। সঙ্গে সঙ্গে সব সুখ

নিমেষে উধাও। মুহূর্তে মনটা একটা বিষাদের পিণ্ডে পরিণত হয়।

কোনোদিন হয়তো ঋতুর পরিবর্তনে আকাশ গভীর নীল, একটু মেঘ একটু রোদ, একটু ছায়া, ছুটে আসা হাওয়া—, অকারণেই হৃদয়ে খুশি ছলছল করে, গলায় সুর উঠে আসে। অমনি তাকাবে সন্দীপন, চোখে সেই দৃষ্টি, 'কী, ভাবি ফূর্তি যে, কোন বার্তা পৌঁচেছে কানে? এই হতভাগ্যের কপালে তো চিরদিন ভ্রূকুটিই জুটেছে। অকর্মণ্য অপদার্থ—আর কী কী?—' আবার সেই বিষাদের মেঘ বজ্র হয়ে ছুটে আসে। তারপর শুধু একটাই সংজ্ঞা, বিষাদ। বিষাদ। বিষাদ।

এ সব অবশ্য বিমলেন্দু রায়ের জানবার কথা নয়, জানেনও না। মনে হয় ইদানিং তার মানসিক অবস্থাও খুব সুস্থির নয়। সর্বদাই চিন্তিত, সর্বদাই বিমর্ষ। কেবল ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বসে থাকেন। বাচ্চাদের নিয়ে নিয়ে আর তেমন হৈ চৈ নেই, নবকিশোরী কন্যাকে নিয়ে গৌরব নেই, মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিতভাবে কারো না করো জন্য একটা উপহার এনে অবাক করে দেয়া নেই, থপ থপ করে নীল কাছে এলেই যা সুখ।

দেবযানী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার শরীর কি আবার খারাপ হয়েছে?'

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন, 'কৈ, না তো।'

'প্রেসারটা চেক করিয়েছেন?'

'করিয়েছি।'

'ঠিক আছে?'

'মোটামুটি।' তারপর চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললেন, 'সর্বস্বান্ত হয়ে প্রেস কিনেছিলাম, প্রেস আমার সৌভাগ্যশশী অপহরণ করেছে।' আবার চুপ। আবার মৃদু হাস্যে বললেন, 'যে সংস্থার ডিরেক্টার হয়ে পনেরো বছর কাটালাম, তা-ও দেখছি টলোমলো।'

দেবযানী চিন্তিতভাবে বললেন, 'সন্দীপন জানে?'

'এসব কথা তো কাউকেই বলা যায় না? শুধু সন্দীপনকেই বলতে পারতাম। কিন্তু এমনিতেই ওর চিন্তা করা স্বভাব। আগে থেকেই

ভাবতে বসে, কী হবে। ক'মাস ওর উপর কম স্ট্রেইন যায়নি। শুধু ছবির আয়েই তো সংসারটা চালাতে হয়েছে। অবশ্য আপনিও তাতে অনেকটাই সাহায্য করতে পেরেছেন। আমার কাছে যেদিন গিয়েছিলো, এসবই বলছিলো। আমি আসাতে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এ অবস্থায় যদি জানতে পারে আমিই আমার পায়ের তলায় মাটি খুঁজছি তবে আব কার উপব নির্ভর কবে নিশ্চিত থাকবে।'

সন্দীপন বাড়ি ছিলো না, এলো, এসে দুজনকেই বিরস মুখে চুপ করে বসে থাকতে দেখে থমকালো, তারপর ভিতবে ঢুকে গেল।

রাত্তিরে বললো, 'আমাকে দেখে তখন হঠাৎ কথা থামিয়ে ওরকম চুপ কবে গেলে কেন?'

'না তো।'

'তুমি আমাকে যতো বোকা মনে কবো, আমি কিন্তু ততো বোকা নই।'

দেবযানী হেসে হাত ধরলেন, 'না ততো নও, তার চেয়ে একটু বেশী।'

'হিপোক্রিট।'

আচমকা রেগে গেলেন দেবযানী, 'তোমাকে আমি সাবধান কবে দিচ্ছি সন্দীপন, এভাবে অনর্থক অপমান করে কথা বলবে না।'

'তবে শুনে রাখো মহারাণী, তুমি আর আমার কাছে সম্মানের যোগ্য নেই।'

'সম্মান কবার যোগ্যতাও তোমার নেই।'

'তাই নাকি?'

'তুমি ধরেই নিয়েছ প্রত্যেকটি লোক তোমার সাবঅরডিনেট, এক বিরতিহীন আনুগত্যে আবদ্ধ থাকতে তারা বাধ্য, এই স্বভাবের জন্য একদিন তুমি চরম শাস্তি পাবে।'

'তাতো বলবেই, এখন তো বলবেই এসব কথা।'

'বিমলেন্দু রায়কে আমি ডেকে আনিনি, তুমিই এনেছো।'

'আমি সশরীরে গিয়ে শব্দ করে ডেকে এনেছি, তুমি অশরীর হয়ে নিঃশব্দে কতোবার ডেকেছ তাতো আর কেউ শুনতে পায়নি ?'

'যদি না-ই পেয়ে থাকো তবে আর বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করছো কেন ?'

'বাতাসের গলায় দড়ি ? অস্বীকার করতে পার যে তোমার কোনো দুর্বলতা নেই ?'

এবার বালিশে মুখ গুঁজে দেবযানী কেঁপে ওঠেন, জবাব দিতে পারেন না। যার কাছে মিথ্যে কথা উচ্চারণ করা যায় না, সত্য কথাও বলা যায় না মুখ ফুটে, তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন ? সন্দীপন শক্ত করে হাত চেপে ধরে, হাড ভেঙে যেতে চায়। বলতে ইচ্ছে করে যদি কারো প্রতি অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন পবিত্র কোনো ভালোবাসা থেকেই থাকে আমার অন্তরে, কেন তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাইরে আনতে চেয়ে নিজেও জ্বলো আমাকেও জ্বালাও। বলেন না। তিনি জানেন, আবহমান কাল থেকে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এই সুতোও দুর্লঙ্ঘ্য। সুতরাং যন্ত্রণাও অনিবার্য।

সেই অনিবার্য যন্ত্রণাতেই বিধ্বস্ত হয়ে আস্তে আস্তে সন্দীপন কেমন নিস্পৃহ হয়ে গেল। দেবযানীর জীবন থেকেও অনেক দূরে সরে গেল, বিমলেন্দুর জীবন থেকেও অনেক দূরে সরে গেল। এই দুজন মানুষকেই সে প্রাণতুল্য ভালবাসে, তাদের কাছ থেকেই এই ধাক্কা তার কাছে সহনীয় ছিল না। কী দুর্ভাগ্য।

বিমলেন্দু রায় বলেন, 'সন্দীপনের কী হয়েছে ? আমি এলেই একটা দুটো কথার পরে চলে যায় নিজের কাজে। গল্প নেই, আড্ডা নেই, কেমন ম্রিয়মান। বড্ড বেশী টাকা পয়সার কথা চিন্তা করে বোধ হয় ?'

দেবযানী আমতা আমতা করে বলেন, 'না, না, ওতো ঐ রকমই কাজ-পাগল মানুষ।'

দেবযানীই বসেন, চা দেন, কথা বলেন, আপিসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে

যায়, উনি আর ওঠেন না। দেবযানী খেয়ে যেতে বলেন, খানও না। পরে জানা গেল অপিসে স্ট্রাইক চলছে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মাইনেও বন্ধ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

সব শুনে সন্দীপন বললো, 'তাতে কী হয়েছে? আমিই তো আছি। একখানা ধুতি দু-খানা করে পরলেও ভাগ করে নিতে পাববো। আশা করি দেবযানী আমাদেব না খাইয়ে বাখবে না।'

বিমলেন্দু রায় দেখতে শুনতে শক্ত পোক্ত, ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কোথায় অদ্ভুত একটা কাঙাল মন কিসেব প্রত্যাশায় অঞ্জলি পেতে আছে। সন্দীপনের এই কথায় তাঁব পকেট থেকে রুমাল বেরিয়ে এলো। সমস্ত আবহাওয়া সহজ করে দিয়ে সন্দীপন হাঁকডাক শুরু করে দেয়, 'কানাই চা দে', 'মনি, আজ আমাদেব কী মাছ খাওয়াচ্ছ? ও সব চুঁনোপুঁটির জাপানী মাল চলবে না, জার্মান মাল চাই।' সন্দীপনের ফূর্তির গলা সকলের মনের সকল ভার কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

জনান্তিকে দেবযানীকে বলে, 'মনে বেখো, আমার উপার্জন আব বিমলেন্দুর উপার্জন কখনো আলাদা নয়। কখনো যেন কেউ না ভাবে সেটা।'

॥ সাত ॥

এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার শেষের বছরটা বড়ো কষ্ট পেয়েছেন ভদ্রলোক। এক পয়সাও সঞ্চয় না রেখে খরচ করার অপরিণামদর্শিতা তাঁকে বড়ো কঠিন শাস্তি দিয়েছে। দেবযানীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত সব উজাড় করে দিতেন বোন ভগ্নীপতিকে। তারপরেও যে তার পরিপূর্ণ বিরতি ঘটেছিলো তা নয়। আর জিনিসের তালিকাতেই বা কতো কিছু পাঠাতেন! উপলক্ষ্য তো লেগেই আছে। দামী ছাড়া কোনো কিছুতে তো মন উঠতো না? সেই তিনিই নিতান্ত দুর্বিপাকে পড়ে যখন বোনের কাছে কিছু টাকার আবেদন জানিয়ে চিঠি

লিখেছিলেন, বোন দেয়নি। জবাবে লিখেছিলো, তোমার ভগ্নিপতি বলছনে, তাঁর পক্ষে কাবোকে ধাব দেয়া এখন অসম্ভব। তাছাড়া এই ধারদেনার ব্যাপাবে শেষ পর্যন্ত অনেক মনোমালিন্যেব কাবণ ঘটে, অন প্রিন্সিপল সেই সব ঝামেলায় তিনি যেতে নাবাজ। তাছাড়া এতো বৎসর যাবৎ আর্টিস্ট সন্দীপন মিত্রের পিছনে যে অর্থ তুমি ঢেলেছ তাকে কেন তা ফেরত দিতে বলছো না ?

চিঠিটা দেবযানীকে পড়তে দিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটিব সঙ্গে ওব বিয়ে দেবাব জন্য আমি পঁচিশ হাজার টাকা খবচ করেছিলাম। ইঞ্জিনিয়াব পাত্র দেখে শুনে আমিও ক্ষেপে গেলাম বোনও ক্ষেপে গেল। যে কারখানায় আমি ডিরেক্টার ছিলাম, সে কাবখানায় আমারও অর্ধেক শেয়াব ছিলো। সেই অধিকার বেচে তবে তাকে পাওয়া গেল। এই আমাব সেই বোন আব সেই ভগ্নাপতি। এবং সেই কারখানা থেকেই আজ আমি বিতাড়িত।'

শুনে ঝাপসা চোখে দেবযানী আকাশ বাতাস দেখলেন।

যতোদিন সম্ভব ততোদিনই তিনি পড়ে ছিলেন এখানে। একদিন দেবযানীই বললেন, 'এটা কি একটা জীবন ? আপনি এ থেকে মুক্তি নিন। কতো কাজের অফার আসছে, চলে যান।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাবো ? কেমন করে থাকবো ?'

বলতে গলা বন্ধ হয়ে এলো দেবযানীর, তবু বললেন, 'কিন্তু আমরা তো আপনার কেউ না।'

তিনি বললেন, 'আমি তো আপনাদের কাছে কোনো জাগতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইনি। আপনি জানেন, এই সন্তানরা আমার নয়, সমস্ত পৃথিবী জানে আমি তাদের পিতা নই। কিন্তু জন্মদাতা না হয়েও জন্মদাতার সকল স্নেহ আমি ওদের জন্যই সঞ্চিত রেখেছি। আর সন্দীপন ? অর্জুনের যেমন কৃষ্ণসখা, সেও আমার কাছে তাই। একাধারে বন্ধু ভ্রাতা প্রভু। এই দুর্জয় অর্থাভাবের অন্ধকারে একদিনও সে আমাকে

পথ হারাতে দেয়নি। আর আপনি?' তাকালেন, 'অভিধানে কি তার কোনো নাম আছে?'

এর কয়েক মাস পরে সত্যিই তিনি চলে গিয়েছিলেন। কোনো এক ভোররাত্রে দরজায় টোকা। প্লেন ছিলো পাঁচটায়, রওনা হচ্ছেন পৌনে চারটেতে। জানতো সবাই। আগের রাত্রেই বিদায়ের পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। ঘুমোবার আগে সকলের চোখই টকটকে লাল। সন্দীপন অত্যন্ত বিচলিত। যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নীলকে বুকের থেকে নামাননি; তিন মেয়েকে কাছ ছাড়া করেননি, সন্দীপনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলেছেন, 'আমৃত্যু আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

তবু ভোররাতে আর একবার তিনি এসেছেন। দেবযানীর পাতলা ঘুম ভেঙে গেছে সহজেই। আলো জ্বেলে জানালায় তাকিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ বিদ্ধ রেখে বিমলেন্দু রায় নিচু গলায় বললেন, 'আর একবার দেখতে এলাম।'

দেবযানী অস্ফুটে বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

'সময় নেই।' ঘড়ি দেখলেন, 'প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন, আপনি ডাকলেই আমি চলে আসবো—' হাত ধরলেন, 'হয়তো এই শেষ।'

নীচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল, নেমে গেলেন কয়েক সিঁড়ি, আবার ফিরে এলেন, দুই কাঁধে দুই কম্পিত হাত রেখে বললেন, 'পৃথিবীতে কারো একবিন্দু ক্ষতি হবে না দেবযানী, শুধু সেই সম্বল আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।' নিচু হয়ে চুম্বন করলেন। দেবযানী বাধা দিলেন না।

না, দেবযানী আর তাকে কোনোদিন ডাকেননি। তিনিও আর কোনোদিন আসেননি। মাইসোরে ছিলেন। একবার সন্দীপন মাদ্রাজে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে চলে যায় সেখানে, কয়েকদিন একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসে। বুলু আর তার স্বামীও গিয়ে থেকে এসেছে একবার। নীলও গেল শেষ পর্যন্ত। ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়া পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিটিকে দেখবার কৌতূহল তার অনেক দিনের। দেখা হওয়া

মাত্রই সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, ওবে আমার সেই ছোট ছেলেটারে বলে যুবক নীলের দামী আমেরিকান সার্ট ভিজিয়ে দিয়েছেন চোখের জলে। ওরা হাতে ধরে অনুনয় করেছে একবার আসতে, আসেনি।

একদিন দুদিন আগের কথা নয়, পুরো পঁচিশ বছর গড়িয়ে গেছে তারপরে, কতো ঋতু কতো আঁকিবুকি কেটেছে জীবনের স্তরে স্তরে। যে সন্দীপনকে তিনি এক পাল্লায় ওজন করেছেন, আর এক পাল্লায় সব, সেই সন্দীপনও একদিন সন্ধ্যাবেলা বিদায় না নিয়েই চলে গেল। অথচ দেবযানীকে ছাড়া সে একটা দিনও কোথাও থাকতে পারবে বলে ভাবেনি। সমস্ত শিক্ষা সভ্যতা ভুলে সমস্ত শক্তি দিয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। সেই চিৎকারটা তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন আকাশে যাতে শুনতে পেয়ে ফিরে আসে সন্দীপন। সে শোনেনি, সে আসেনি। শুধু পরিজনেরা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছিলো।

আর এই আজ, আজ পড়ন্ত বেলায় সকালের বাসি খবরের কাগজটা হাতের কাছে পেয়ে অকারণেই নাড়াচাড়া করতে করতে একটি কোণে একটি সংবাদ দেখে দুই ভুরু এক করলেন। তিন জনের শোকসংবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম নামটি বিমলেন্দু রায়। তিনি কে ছিলেন কী ছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আছে ছোটো অক্ষরে।

কাগজটা হাতে আটকে রইলো, চোখ আটকে রইলো কাগজে। আস্তে আস্তে বেলা গেল, বিকেল সন্ধ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো।

চুপ করেই ছিলেন, চুপ করেই রইলেন, কাউকে কিচ্ছু বললেন না। রাত হলে যৎসামান্য আহার সেরে ঘুমিয়েও পড়লেন। অথচ মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে হু হু করে কোন রন্ধ্র দিয়ে যে বন্যার মতো শোক ছুটে এলো কে জানে। জাগ্রত অবস্থার মনের জোর কি তবে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যায়? নৈলে কেন নিজেকে আর কোনমতেই শান্ত রাখতে পারছেন না? এখন ঘরে কেউ নেই, তিনি একা আর কমানো লণ্ঠনের আলো আঁধারি ছায়া। এই শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কেউ তাঁকে ঘিরে বসে নেই,

থাকবেও না। এটা যে তাঁর শোক তাই বা কে জানে? কাকে তিনি বলবেন? যে নিঃশব্দে ভালোবাসা এতোকাল ধরে বহন করেছেন হৃদয়ে এই শোকও তেমনি করে তাঁকেই বহন করতে হবে একা একা।

টি'কতে না পেরে উঠে বসলেন। পায়ের তলার নিচু আলমারীর মাথায় সন্দীপনের একটা অল্প বয়সের ছবি। মশারির আচ্ছাদন ভেদ করে, জলভরা চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টি ভেদ করে, লণ্ঠনের কম আলো ভেদ করে সেই ছবিটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দু হাত বাড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন তিনি, যেন পা জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নিখিল বিশ্ব মথিত করে একটা জিজ্ঞাসা উত্থিত হলো। তোমরা কোথায়? কোথায়? সেই জিজ্ঞাসাও শব্দ করে নয়। বাতাস, নিঃশব্দে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে ভোরেব গন্ধ ঘরে ঢুকলো। পুবের জানালা দিয়ে সুর্যের আভাস।

তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক হয়ে উঠে বসলেন। মনে পড়লো সকাল সাড়ে ছ'টার ট্রেনে মিলুরা ফিরে যাবে আসানসোলে। সপ্তাহান্তে দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে। মিলুর সুবাদে তার দিদি বুলুও কাল রাতে বাড়ি ফিরে যায়নি, বোনের সঙ্গে থাকবে চলে যাওয়া পর্যন্ত। মিলু স্টেশনে যাবার পথে তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দেবে। ওরা তো মায়ের উপর সব বরাদ্দ দিয়ে ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। এবার ডেকে দিতে হয়। ভাবলেন, এই তো জগৎ। সবাই তো বসে আছি অপেক্ষাগৃহে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কতো দুঃখ বেদনা মান অপমান ভালোবাসা ঘৃণা—অথচ কিসের বা কী মূল্য। শক্ত হাতে আঁচল দিয়ে চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে ঢোঁক গিলতে গিলতে প্রার্থনা করলেন, 'হে ঈশ্বর এইবার আমাকেও তুমি নাও।'

মশারী সরিয়ে পা দিলেন শক্ত মাটিতে। সংলগ্ন ঘরের পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাঙাভাঙা গলায় ডাক দিলেন, 'ও বুলু মিলু সোমামনিরা, তোমরা ওঠো, নীলকে ডাকো, স্টেশনে যাবে যে, ভোর হয়ে গেল।'

———